
খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
2768
গল্প বলি
গল্প শোনো

গল্প বলি গল্প শোনো

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অশোক প্রকাশন
ক লি কা তা - বা রো

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৭৬

॥ দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-বারো হইতে অশোক প্রকাশন-এর পক্ষে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ৭এ বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা-নয় হইতে অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর পক্ষে বঙ্কিম বিহারী রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিবিধ শিশু ও কিশোর পাঠ্য সাময়িক পত্রিকা ও বার্ষিকে প্রকাশিত আমার গল্পগুলির একাংশ এই সংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

দক্ষিণ দমদম,
কলিকাতা-২৮
আষাঢ়, ১৩৭৬

উৎসর্গ

ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

এতে আছে

গল্প বলি গল্প শোনো



সত্যি ভূতের গল্প

রাত তখন আটটা হবে—

আসরটা খুব জমাট। বৃষ্টিও ঝেঁপে এলো, শচীন হাত তুলে চেঁচিয়ে বললে—এই তোমরা সব শোনো আমার কথা। এটা সত্যিকারের ভূতের গল্প। ভূতটাকে একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—

ফণী বললে—তোর চোখে তো মাইনাস আট পাওয়ারের চশমা। তুই যতটা দেখিস তার চেয়ে দশগুণ করিস কল্পনা।

পূর্ণ গল্প ভালোবাসে, বললে—আহা! শোনই না। সবটাই কী আর মিছে কথা হবে?

শচীনের মুখ লাল হয়ে উঠলো; বললে—মিছে কথা বলতে ওস্তাদ তুমি। ওতে যদি কোনো প্রাইজ থাকতো তাহলে তুমি পেতে প্রথম পুরস্কার আর ঐ সঙ্গে একটা এক্‌সট্রা মেডেলও। আমি যা বলছি, এর শতকরা একশো ভাগই সত্যি—

বরদা বললে—চটো কেন? আমরা কেউ কিছু তো বলছি না। তবে ভূতটুথ— !

শচীন হাত নেড়ে বললে—বলছি তো একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা –

—ভূত?

--হ্যাঁ। রিয়াল গোসট। আমাদের বাড়িতে সেই যে চাঙড়ীপোতার চণ্ডী আসতো, দেখেছো তো? সেই যে কালো, রোগা, ঢ্যাঙা, চোখ দুটো বড়ো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ডান পা-খানা একটু ছোট বলে নেঙচে চলতো—?

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই—সেই—যে খুব কাঁঠাল খেতে পারতো?

—ধ্যেৎ! কাঁঠালের সময় সে কোনোদিন আসেই নি। আসতো পৌষ মাসে—

পূর্ণ খাটো গলায় বললে—পিঠে খেতে! কিন্তু স্বর খাটো হলেও তার হুলটুকু গিয়ে বিঁধলো শচীনের মনে। সে কটমট করে পূর্ণর দিকে তাকিয়ে বললে—ও খুব মাছ ধরতে ভালোবাসতো। গ্রীষ্মের পর একটু বর্ষা পড়লেই চারের পোঁটলা আর ছিপ হাতে চণ্ডী সেই কোথায় তিন ক্রোশ দূরে ষষ্ঠী ডাঙার ঘোষেদের পুকুরে, সাত মাইল দূরে কুমীরখালির জোড়া-দীঘিতে, দু'ক্রোশ দক্ষিণে বাবুহাটির বিলে, তার এধারে শঙ্খপুরের ঝিলে মাছ ধরতে যেতো। ওর সঙ্গে মাছের কেমন একটা যোগ ছিলো। যেখানেই যাক, যে দিনই ধরুক, ওর হাতে মাছ উঠতোই। আমরা যে পুকুরে চার দিয়ে ছিপ ফেলে তিনদিন বৃথা বসে থাকবো, একটা মাছও বঁড়শী টানবে না, ও সেখানে মাত্র এক ঘণ্টা বসেই হয়তো দশ-সেরা এক রুই, কি পনেরোসেরা এক কাতলা তুলে ফেলতো। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার!

পূর্ণ বললে—এই থেকে প্রমাণ করা যায়, ও গত জন্মে বেড়াল বা ভোঁদড় ছিলো—

নারায়ণ ডাক্তারী পড়ছে; সে জন্যে তার ধারণা—প্রাণীজগৎ

সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। সে বললে—সীল, শ্বেত ভাল্লুকও হতে পারে আবার কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়—

পূর্ণ ও নারায়ণের দিকে শচীন একবার ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—তা সেবারেও গ্রীষ্মের পর রীতিমতো বর্ষা এলো। জলাগুলো উঠলো জলে ভরে, মাঠে মাঠে ঘাস উঠলো গজিয়ে, ঝোপ-জঙ্গল ঘন হলো, গাছ-পালা-হলো শ্যামল, সতেজ। আকাশে সারাদিন-রাতই মেঘের মেলা। সেই সঙ্গে চণ্ডীটাও উঠলো ক্ষেপে। রাঙা পিঁপড়ের বাসা ভেঙে, বোলতার চাক পেড়ে, মেথি গুঁড়িয়ে, সুজি ভেজে সে চারের আয়োজন করতে লাগলো। তাদের চালের বাতায় ছিল ছিপ, কাঠের বাক্সে হুইল, সূতো আর ছটা বঁড়শী। সে-সব পেড়ে, বার করে, ঘোষেদের একটা রাজহাঁসের পালক ছিঁড়ে তাই দিয়ে ফাৎনা তৈরি করে, চায়ের মোড়কের রাংতা গালিয়ে তার ভার লাগিয়ে তিনদিনে তৈরী হয়ে নিলে! কিন্তু কোথায় যে মাছ ধরতে যাবে তা কারুকে বললে না।

'সেদিন ভরা অমাবস্যা। সকাল থেকেই আকাশভরা কালো মেঘ। মাঠের শেষে দূরে তাল-নারকোলের শ্রেণী। সেগুলোও কালো দেখাচ্ছে। মাঠখানাকেও লাগছে কালো মতো। বাতাসও বইছে ভিজে, এলোমেলো। ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টিই হয়ে গেলো। চাঙড়ীপোতায় আমার মামার বাড়ি,—কলকাতা থেকে সেখানে আম খেতে গেছি, কিন্তু গিয়ে দেখি, মামাদের বাগান ফাঁকা। আম তো ফলেই নি, যে ক'টা ফল ছিলো, সেগুলোও বাঁদরে খেয়ে গেছে, তবুও সকালে উঠেই আঁকষি হাতে বেরিয়ে পড়লাম।

'বাগানের পাশ দিয়ে মাঠে যাবার পথ। গাছের তলায় তলায় বৃথা ঘুরে, বাগান থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি, চণ্ডী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার একহাতে ছিপ, আর একহাতে গামছায় পোঁটলা করে বাঁধা চার, টোপ; বগলে বাঁশের বাঁটওয়ালা ছাতা, গায়ে আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী, পায়ে রবারের জুতো। আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললে—শচীদা! সকালে উঠেই গাছ ঠেঙাতে বেরিয়েছো?

চণ্ডীটা আমাকে বরাবরই বড়ো ভক্তি করতো। আমি ওর ঠিক আড়াই বছরের বড়ো।

নারায়ণ বললে—হ্যাঁ। তার ঐ কথাগুলো ভক্তেরই উপযুক্ত বটে। যেমন গুরু, তেমনি চেলা!

পূর্ণ বললে—এবার আমি কিন্তু কিছু বলিনি—

বরদা বললে—আহা—হা! বাধা দাও কেন? তুমি বলো—

শচীন বললে—তার উত্তরে বললাম—আমি ভোরে উঠেই গাছ ঠেঙাচ্ছি, তুই বা কোন দুপুরে ছিপ হাতে বেরিয়েছিস? কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত তুলে বললে—সেই পোড়ো দীঘিতে যাচ্ছি।

কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। বললাম—বলিস কিরে! সে যে ভূতের আড্ডা। ওখানে কত লোক যে অপঘাতে মরেছে তার হিসেব নেই। আজ পর্যন্ত ও পুকুরে কেউ—ফিরে যা, ফিরে যা—

চণ্ডী হেসে বললে—ভূত বলে কিছু নেই, শচীদা! একেবারেই কিছু নেই। তুমি দেখো, আমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসবো। খালি হাতে নয়, অন্ততঃ দশসের ওজনের দুটো রুই ঝুলিয়ে। এই বলে রাখছি, সকলের প্রথমে যে মাছটা ধরবো, সেটা তোমার।

—না রে চণ্ডী, এমন কাজও করিসনি। ওখানে কী মানুষ যায়?

চণ্ডী অবশ্য শুনলে না; একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে গেলো। আমি তার বিলীয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, ছোঁড়াটা পাগল হয়ে গেছে। পোড়ো দীঘিটার এক ক্রোশের মধ্যে কোনো মানুষ যেতে সাহস করে না। কোনো গোরুও সেদিকে ঘাস খেতে যায় না; এমনকি রাতেরবেলা শেয়াল-কুকুরও সেদিক থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে আসে। কেবল চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচারাই সেখানে রাত কাটায়। আর ও কিনা একা সেখানে মাছ ধরতে যাবে?

ফণী বললে—কেন?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবো? দীঘিটা যে কতো কালের, এর হিসেব ও অঞ্চলের কোনো জমিদারেরই সেরেস্তায় নেই। কেউ বলে, আলাউদ্দীন খিল্‌জীর সময়ের, কেউ বলে আকবর বাদ্‌শার আমলের, আবার কেউ বলে, ওয়ারেন হেস্টিংস্ যখন ছিলো—তখনকার। ওখানে নাকি এক সাহেব থাকতো। কিন্তু আমার দাদামশায় বলেন, ওটার বয়স মাত্র একশো দশ বছর। ওখানে ছিলো রতনা ডাকাতের আড্ডা।

রতনা ছিলো, আবার তাঁর দাদামশায়ের স্যাঙাৎ। ডাকাতি করতো রতনা, কিন্তু তাতে ভাগ বসাতেন আমার দাদামশায়ের দাদামশায়। সে পয়সায় তিনি জমিদারী কিনেছিলেন। অবশ্য সে জমিদারী, জমিদারবাড়ি এখন আর নেই। কেবল দাদামশায়ের ঘরে একটা পেল্লাই কাঠের সিন্ধুক, একখানা মরচেধরা ভোজালী, আর একখানা পোকায় কাটা জামিয়ার পড়ে আছে। যাক;—নিজেদের ঘরের বড়াই না করাই ভালো।

রতনা পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের গলায় পাথর বেঁধে ঐ দীঘিটাতে ডুবিয়ে মারতো।

দ্বিজেন বললে—এতো পাথর সে পেতো কোথায়? চাঙড়ীপোতা তো পাথুরে জায়গা নয়।

বরদা বললে—আরে বাপু! গল্পটা শোনোই না।

শচীন বললে—একবার এক বুড়ি আর তার ছেলেকে রতনা তো ধরে নিয়ে এলো। তাদের সঙ্গে ছিল খান দুই সোনার গহনা, গোটা দশেক টাকা। বুড়ির ছেলেটা ছিলো বেশ ষণ্ডা গোছের। রতনার লোকের সঙ্গে তার বেশ একটু লাঠি-বাজি হলো। ফলে লোকটার নাকটা একদম মুখের ওপরে গেলো বসে। রতনা এই অপমান আর ক্ষতির শোধ নেবার জন্যে বুড়ির চোখের সামনে ছেলেটাকে দীঘিতে ডুবিয়ে মারলে।

'বুড়ি তখন আকাশের দিকে হাত তুলে চীৎকার করে বললে—রতনা, যদি ভগবান থাকে, তুই-ও একদিন দম আটকে মরবি। তোর সদগতি কোনো কালেই হবে না—!

'দাদামশায় বলেন, তাঁর দাদামশায় নাকি বলেছিলেন, বুড়ির শাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিলো। রতনা একদিন ঐ দীঘির ধারে দালানটার মধ্যে দম আটকে মরে। কি করে, তা আর বলেননি। সেই থেকে নাকি রতনা ওখানে ভূত হয়ে আছে। চামচিকে বাদুড় আর পেঁচা ছাড়া রাতেরবেলা যে ওদিকে যায়, রতনা তারই গলা টিপে মারে। বেঁচে থাকতে বেটার যে অভ্যেস ছিলো, মরবার পরেও সে স্বভাব ঘুচলো না! ঐ যে কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে—এ তারই ভৌতিক প্রমাণ। যাক।

'দাদামশায় তখন ছোটো, একবার দীঘিটার ধারে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্যাঙাতের নাতি বলে রতনা তাঁকে কিছু বলেনি। তবে দাদামশায়কে স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলো—ওদিক আর কখনো মাড়াসনি!

'সত্যি কথা বলতে কি, দাদামশায়ের শেষের কাহিনী আমি বিশ্বাস করিনি। কেননা তিনি ডেলা ডেলা আফিং খান। চণ্ডীটার জন্যে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেলো। কি যে করা যায়, ভাবতে ভাবতে তার দাদার কাছে গিয়ে খবরটা জানালাম। শুনেই তিনি জ্বলে উঠলেন; বললেন—ভূতের কিল খেয়ে আজ ওর শিক্ষা হোক। আমরা তো কিছুতেই ওকে সায়েস্তা করতে পারলাম না।

'বললাম—ভূষণ্ডীদা, শিক্ষা তো তোমার পরে; তার আগে যে প্রাণহানির—

'ভূষণ্ডীদা জিভ দিয়ে তালুতে চক করে একটা শব্দ করে বললেন—চণ্ডের প্রাণ নেবে ভূতে? এমন বাহাদুর ভূত আজও প্রেতলোকে জন্মায় নি—

'এর ওপর আর কি বলবো? বাড়ি এসে চুপ করে বসলাম,—বলে শচীন থামলো।

বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দূরে কোনো অট্টালিকার মাথায় বাজ পড়লো। বৃষ্টি ও বাতাস মেতে উঠেছে। শার্সিগুলোর গায়ে এসে দুটোতেই মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—তারপর—তারপর ?

শচীন বললে—চণ্ডী তো চলেছে—

পূর্ণ বললে—তুমি কি করে জানলে ?

শচীন হাত নেড়ে, ভ্রূ কুঁচকে বললে—আরে, এটা তো আস্ত ইডিয়ট দেখছি। চণ্ডী যে তখন চলেছে, এ কথা কে না জানে ?

সকলে বলে উঠলো—ঠিক—ঠিক। বলে যাও, বলে যাও—

'চণ্ডী আলের ওপর দিয়ে চলেছে। তার দু'ধারে শস্যশূন্য ভিজে ক্ষেত। চাষীরা কোনো ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে। ক্ষেতের এখানে সেখানে দু'টি একটি তালগাছ। বিশ্বনাথের মন্তর ভরা মাদুলীর মতো তাদের মাথায় জটার মধ্যে একটি করে কলসী বাঁধা। ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গ্রাম। কালো মেঘের গাঢ় ছায়ায় সেগুলো ঝাপসা হয়ে আকাশের তলে মিশে আছে। চাঙড়ীপোতা থেকে সয়লা গাঁয়ের নদীটা এক ক্রোশ দূরে।

'চণ্ডী মাঠ ভেঙে দীঘিটার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছোলো, তখন বেলা ন'টা হবে।

'দীঘির চারধারে ঝোপ-ঝাড়। তার মাঝে মাঝে তাল, নারকোল ও কয়েকটা আম-কাঁঠালের গাছ। চণ্ডী শুনেছিলো, সেখানে একটা বাড়ি আছে। কিন্তু কৈ—কিছুই তো—ঐ যে একটা দালান। চণ্ডী সেখান থেকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। দালানটার ছাদ ভেঙে পড়েছে, একধারে দেওয়াল ধ্বসে খানকয়েক কড়িকাঠ বেরিয়ে আছে। ছাদের ভাঙা আলসেয় কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ, নিচে চারধারে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। তার মাঝ থেকে কি একটা লতা যেন ওপর দিকে উঠে দালানটার একদিকে ঢেকে রেখেছে, দালানটার দিকে তাকিয়েই চণ্ডীর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। কিন্তু দিনের বেলায় কিসের ভয় ?

'সে জঙ্গল ঠেলে দীঘিটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। জঙ্গলের জলে যে তার কাপড়-জামা ভিজে গেছে, সে দিকে খেয়ালই নেই। তার সামনে প্রকাণ্ড দীঘি। তার প্রায় অর্ধেকটা পদ্মবন, বাকীটুকু কলমী,

হেলঞ্চ, পানায় ভরা। হঠাৎ একটা বড়ো মাছ ঘাই দিয়ে উঠলো। সেই সময় চণ্ডী দেখলো, দীঘিটার জলের রং একটু লাল। কিছু দূরে একজোড়া বক বসেছিল। চণ্ডীর সাড়া পেয়ে তারা মোটা গলায় বকর বকর করে ডেকে সেখান থেকে উড়ে গিয়ে ওপারে শেওড়া গাছটার মাথায় বসলো।

ফণী বলে উঠলো—এই যে বললে, সেখানে যে যায় রতনা তারই গলা টিপে মারে?

শচীন বললে—তোর শরীরটা যেমন মোটা, বুদ্ধিটাও তেমনই ভোঁতা। কাক-চিল-বক অর্থাৎ কোনো রকম খেচরকেই মারে এমন সাধ্য ভূতের বাপেরও নেই।

ক্ষিতীশ রোগা মানুষ, এতোক্ষণ চুপ করে শুয়েছিলো। পা দুখানা দোলাতে দোলাতে বললে—এরোপ্লেনও তো খেচর। তাকেও—?

শচীন বললে—চুপ কর উইচিংড়ি। তোকে আর চিড়িং চিড়িং করতে হবে না। বেশ, তোমাদের যদি শুনতে ইচ্ছে না হয়, আমি আর—

সকলে বলে উঠলো—বলো—বলো। চণ্ডী সেখানে তারপরে কি করলে?

'চণ্ডী দীঘির ধারে একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে তার ছাতা, ছিপ আর পোঁটলাটা সেখানে রাখলো। তারপর পোঁটলাটার ভেতর থেকে ছোটো কাটারীটা বার করে খানিকটা জায়গায় জঙ্গল কেটে জল থেকে কলমী, হেলেঞ্চ ছিঁড়ে পরিষ্কার করে চার ফেলে, টোপ গেঁথে বঁড়শীটা হাতে দুলিয়ে জলে ফেলবার সময় একবার বাড়িটার দিকে তাকালো। তার মনে হলো, ডান দিকের ঘরখানার মধ্যে কে যেন সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে; আর তার চোখ জোড়া আগুনের ফুলকির মতো জ্বলছে। দেখেই চণ্ডীর বুকটা একটু কেঁপে উঠলো। মনে হলো তার শিরদাঁড়া বেয়ে বরফগলা জলের মতো একটা স্রোত নেমে গেলো নিচে। তবুও সে খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলো—সত্যি কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কি না। মিনিট খানেক

পরে লক্ষ্য করে আর কিছুই দেখতে পেলো না। ওটা মনের ভুল ভেবে চণ্ডী ছিপ ফেলে খান কয়েক কচু আর ভাঁট পাতা বিছিয়ে তার ওপর বসলো।

'চণ্ডী তো ছিপের বাঁটটা পা দিয়ে চেপে চুপ করে বসে আছে। চারধার নিস্তব্ধ নির্জন। ভিজে মাটি, পচা ডালপালার গন্ধ নাকে লাগছে। কচুবনে মশার ঝাঁক করছে—পোঁ, পোঁ, দীঘির ওপারে একটা তালগাছের মাথায় বসে একটা দাঁড়কাক থেকে থেকে ডেকে উঠছে—আহা-কাহা; আহা-কাহা। মাঝ-দীঘিতে একটা মাছ ঘাই দিয়ে উঠলো; পদ্মবনের আড়ালে একটা ভীড়ভীড়ে পাখি শিষ দিলো—চিটিররর—চিট।

'চণ্ডীর মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেলো। এমন নিস্তব্ধতা সে আগেও অনেকদিন অনুভব করেছে। কিন্তু আজকের স্তব্ধতাকে বোধ হতে লাগলো যেন পাষাণের মতো বিষম ভারী। কিছুতেই এটা নড়ানো বা সরানো যাবে না। ক্রমেই যেন তা তার বুকের ওপর চেপে বসছে। বাতাস স্থির; আকাশে মেঘদল স্থির হয়ে আছে; একটি ছোটো পাতা পর্যন্ত নড়ছে না, জলও শান্ত। কেবল একটা মোটা খড়কের মতো হলদে রঙের ফড়িং অর্ধমগ্ন ফাৎনাটার ওপর বার বার উড়ে বসছে।

'সে আন্দাজে ঠিক করলো বেলা তখন বারোটা,—সে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিপ ফেলে বসে আছে। অথচ একটা মাছও কথাটা শেষ না হতেই সে জলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো।

'জলের মধ্যে থেকে পানা ঠেলে ভেসে উঠেছে ওটা কি? জিনিসটার রং কালো; দেখতে কতকটা পোড়া কাঠের মতো। সেটা তার দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দেখে চণ্ডীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। সে এতোকাল মাছ ধরেছে, এমন তো কখনো হয় নি। সে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিন্তু সেটা একেবারে কূলের কাছে এলো না, মাত্র কিছুদূর এসে হঠাৎ পদ্মবনের দিকে ঘুরে গেলো।

ঐ যে পিঠের কাঁটা, ঐ যে লেজ, ঐ হাতির কানের মতো কান্‌কো নড়ছে। ওটা রুই মাছ! এতো বড়ো রুই মাছ! চণ্ডী বিস্ময়ে, আনন্দে দু'পা এগিয়ে যেতেই তার ফাৎনাটা একটু নড়ে উঠলো। সে চট্‌ করে একবার পদ্মবনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, মাছটা কোথায়? কিন্তু সেটাকে আর দেখতে পেলো না, ভাবলো ঐ মাছটাই কি ঘুরে এসে তার বঁড়শী টানছে?

'ফাৎনাটা ক্রমেই জোরে ডুবছে ভাসছে। চণ্ডী সে দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রেখে, ছিপটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে কাঠ হয়ে বসে আছে। তার বাঁ গালে, ডান কানে যে দুটো কালো রঙের মশা বসে রক্ত চুষতে চুষতে ফুলে উঠেছে, দীঘির পারে তালবনের মাথায় মেঘে অন্ধকার করে এসেছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই—

ক্ষিতীশ মুচকি হেসে বললে—সে এক মনে ফাৎনা দোলা দেখছে—

শচীন এতোক্ষণ তার দিকে মুখ করে গল্প বলছিলো; এবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—এ রকম করলে বলা অসম্ভব। যদি শুনতে চাও, কেউ একটি কথাও কইতে পারবে না।

—বেশ! এই আমরা মুখে চাবি দিলাম। তবুও শচীন একটু চুপ করে রইলো।

তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলো—ফাৎনা তো ডুবছে ভাসছে। শেষে যেই একবার তল হলো, চণ্ডী মারলে সজোরে টান। সঙ্গে সঙ্গে 'কর্‌র্‌র্' শব্দে হুইলের সুতো খুলে মাঝ দীঘিতে মাছ ছুটে গেলো। আর সেই মুহূর্তেই একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে তালবনের ওপর থেকে সোঁ সোঁ শব্দে বৃষ্টি এলো ছুটে। দেখতে দেখতে বৃষ্টিধারায় সব মুছে গেলো। ওদিকে মাছও ছুটছে।—একবার ডানধারে, একবার বাঁধারে, কখনো, কখনো সোজা মাঝ দীঘিতে। ছিপের মাথা বেঁকে বঁড়শীর মতো হয়ে গেছে। মাছটা থেকে থেকে পদ্মবনে সেঁধোবার চেষ্টা করছে। চণ্ডীরও জেদ তাকে কূলের কাছে আনবেই। এক একবার তার মনে হয়, বুঝি ছিপখানা ভেঙে গেলো।

'এই টানাটানিতে প্রায় ঘণ্টা চারেক কেটে গেলো। এর মধ্যে বৃষ্টি একবারও থামেনি বরং আরো জেঁকে এসেছে। চণ্ডীর অবস্থা তখন—

ভিজে বেড়ালের মতো—

কিন্তু টিপ্পনীটা যে কে কাটলো, শচীন তা ধরতে পারলো না। সকলেরই মুখ গম্ভীর। তবুও তার সন্দেহ হতে লাগলো, এ পূর্ণ কিংবা ক্ষিতীশের কাজ। যাই হোক, না থেমে সে বলে চললো—একে মাছের সঙ্গে টানাটানি করে সে ক্লান্ত, তার ওপর মুসলধারে বৃষ্টি, আর সেই রকম ভূতুড়ে জায়গা। সে মাঝে মাঝে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু মাছটার লেজ বা পিঠের কাঁটা যেই ভেসে উঠতে দেখে তৎক্ষণাৎ সে শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি পায়। এমনি করে বেলা যখন যায় যায় তখন সে মাছটা ডাঙায় তুললো কিন্তু এমন একটা শিকার লাভ করেও তার মনে আনন্দ হলো না। সে যা আশা করেছিলো, মাছটা তার কিছুই নয়। আন্দাজ সাড়ে পনেরো সের ওজনের একটা কাৎলা মাত্র। তার প্রকাণ্ড মাথা, মস্ত মুখ দেখে মনে হতে লাগলো, যেন একটা রাক্ষসের ছানা।—বলে শচীন চুপ করলো। বাইরে তখনো ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে।

তারপর সে আবার বলতে আরম্ভ করলো—'ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। চণ্ডী এতোক্ষণ দেখেনি, ওপারে দীঘির ডান কোণে একটা সরু নালা ছিলো। সেটা দিয়ে হু হু শব্দে মাঠের জল এসে দীঘিতে পড়ছে, তাতে দীঘিটা কানায় কানায় ভরে উঠছে। চণ্ডী ছিপ গুটিয়ে বাকী টোপ ও চারগুলো দীঘিতে ফেলে, মাছটাকে গামছায় বেঁধে বহু কষ্টে দীঘির পাড়ে উঠেই দেখে, চারধারের মাঠ জলে ডুবে গেছে। কিছুদূরে যে জঙ্গলটা ছিলো সেটাও আর দেখা যায় না। চণ্ডীর বুক কেঁপে উঠলো। সর্বনাশ! সয়লা নদীতে বান ডেকেছে নাকি! ছেলেবেলায় আমি আর চণ্ডী একবার সয়লা নদীর বান দেখেছিলাম। সেবার চাওড়ীপোতার অবস্থা হয়েছিলো একটা প্রবালদ্বীপের মতো। সেই স্মৃতি চণ্ডীকে বিচলিত করলো। এই জলস্রোত ঠেলে আড়াই

ক্রোশ যাওয়া একেবারে অসম্ভব। হয়তো পথের মাঝে জল আরও বাড়বে। সে—যে কী করবে ঠিক করতে পারলো না। সেই সময় একবার ভয়ঙ্কর শব্দ করে দূরে একটা তালগাছের মাথায় বাজ পড়লো।

'শব্দ আর আলোর ঝোঁকটা কাটিয়ে সে একবার পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখলো, তার বারান্দার সামনে ঘরখানার দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রথমটা সে ভাবলো মনের ভুল। তারপর আবার সে দিকে তাকাতেই দেখলো, সত্যিই একটা লোক। ঐ যে সে হাতছানি দিতে দিতে ঘরের ভেতর চলে গেলো। তবে কি এখানে লোক বাস করে? ভূতের গল্পটা একদম বাজে? সম্ভবতঃ লোকটা তার দুর্দশা দেখে, তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে। কিন্তু লোকটার স্বভাব ভালো তো? যদি ডাকাত হয়? অবশ্য ডাকাত হলেও তার তখন কিছু করবার ছিলো না। তার কাছে মাছটি ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই নেই। সে আর কালবিলম্ব না করে বাঁ হাতে মাছ, ডান হাতে দা, বগলে ছিপ, আর কাঁধে মাথা দিয়ে ছাতাটা চেপে ধরে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলো।

'জঙ্গল ঠেলে মিনিট পাঁচেক চলে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চণ্ডী উঠোনে গিয়ে পড়লো। সামনেই বারান্দা আর সেই ঘরখানা। কিন্তু কৈ, কাউকে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে না! বারান্দায় ওঠবার সিঁড়িগুলো ভেঙে পড়েছে; বারান্দায় জঙ্গল। এ রকম জায়গায় কি করে মানুষ থাকে? এবার তার মনে একটু ভয় হলো; ততক্ষণে আর একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি বাতাস যেন আরো মেতে উঠেছে। সে আর না এগিয়ে সেখান থেকে চীৎকার করে ডাকলো —কে আছেন? ভেতরে আছেন কে?

'চণ্ডীর মনে হলো, তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা যেন এ ধার থেকে ও ধারে সরে গেলো আর ঘরের মধ্যে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে কি বলছে।

'চণ্ডী আবার বললো—কে আছেন, মশায়? কে আছেন? এবার উত্তর হলো—চলে আসুন।

সামনে অন্ধকার ঘর, বাইরেও অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে সজল বাতাসের হাহাকারে চণ্ডীর মন যেন কেমন হয়ে গেলো। যে ডাকছে সে তো কৈ এগিয়ে আসছে না! ভেতরে কোথাও একটু আলোও তো দেখা যায় না। সে আবার বললো—মশায়,—বড়ো অন্ধকার! একটা আলো।

'ভেতর থেকে উত্তর হলো—এগিয়ে আসুন। চণ্ডী সাহসে ভর করে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের মধ্যে হাত কয়েক এগিয়ে যেতেই তার মনে হলো, কারা যেন অন্ধকারের মধ্যে খিলখিল শব্দে হেসে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে চণ্ডীর পায়ের নিচে মেজেটা একবার হাত পাঁচ-ছয় গেলো বসে, চণ্ডীও সেই সঙ্গে গর্তটার মধ্যে পড়ে গেলো। এমন আচম্বিতে দুর্ঘটনার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। তবুও তৎক্ষণাৎ ওঠবার চেষ্টা করতেই সে দেখলো, একখানা কঙ্কাল তাকে দু'হাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরেছে। দেখেই সে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

'তারপর সন্ধ্যা হতেই আমরা তো ভেবে অস্থির। কিন্তু তখন চণ্ডীর সন্ধানে সেই ভূতুড়ে বাড়ির দিকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব! জলটা আবার বাড়ছে। তবুও সকলে আশা করতে লাগলাম, চণ্ডী এলো বলে। কিন্তু ক্রমেই রাত বেশি হতে লাগলো, তবুও চণ্ডীর দেখা নেই! শেষে রাত যখন বারোটা, জলটা তখন একদম ধরে এলো, কিন্তু বাতাস শান্ত হলো না। সে চারধার থেকে বন্যার কল্লোল বয়ে পাগলের মতো গ্রামের শূন্য অন্ধকার পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমরা আর কি করবো? চণ্ডীদের বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর বসে ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

'ক্রমে রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। আমরাও চণ্ডীর খোঁজে তৎক্ষণাৎ বার হলাম, সংখ্যায় সতেরো জন।

ক্ষিতীশ আস্তে জিগ্যেস করলো—কিসে?

শচীন বললে—ডোঙায়—

পূর্ণ বললে—তালগাছ বুঝি কাটাই ছিলো ?

শচীন বললে—সকলেই তোর মতো মিছে কথা বলে না। চাওড়ীপোতার ব্যাপার তুই কি জানবি ? থাকিস তো বস্তিবাটিতে ! তোরা শোন্, চারধারে জল—যতদূর দেখা যায়—জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তার ওপর দিয়ে টরপেডো বোটের মতো আমাদের সতেরোখানা ডোঙা এগিয়ে চলেছে। বললে বড়াই করা হবে, সেই সার্চপার্টির ক্যাপ্টেন ছিলাম আমিই।

বরদা লাঠি খেলে ; বললে—সাবাস।

'আমি জানতাম, কোথায় চণ্ডীর খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই সকলকে সেই দীঘির দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম। স্রোত ঠেলে, জল কেটে যখন সেখানে গিয়ে পেঁ ৗছোলাম, তখন মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ উঠেছে, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, কিন্তু সেখানকার দৃশ্য দেখে আমার বুক দমে গেলো। এর মধ্যে চণ্ডীকে পাবো কোথায় ! মনের ভাব গোপন করে সকলকে বললাম। ঐ বাড়িটার ভেতর চণ্ডের খোঁজ করা যাক, চলো—

'হরি চক্কোর্তিটা চিরকালের ফাজিল ; বললে—চণ্ডে ওখানে এতোক্ষণ বসে আছে। সে আর কোথাও গেছে! আপনার যেমন কথা—

'বলা বাহুল্য, তাকে তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে থামিয়ে সকলকে নিয়ে বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে পাঁচিলের কাছে গিয়ে হাঁক দিলাম

—চণ্ডী আছো ! চণ্ডী ?

চণ্ডীর দাদা ছিলেন আমার পেছনে। বললেন—একটা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে—না ? ঐ শোনো—ঐ—।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম। হ্যাঁ—ঐ যে—মনে হচ্ছে সামনের ঘরখানার মধ্যে কে যেন গোঙাচ্ছে !

'বললাম—দাদা, আসুন সকলে।

'আমি রইলাম সকলের আগে। সকলের আগেই উঠোন পার

হয়ে বারান্দার কাছে পৌঁছোলাম। এবার শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো। গোঙানির মাঝে মাঝে কে যেন কথা বলছে না? তাই-তো মনে হচ্ছে।

'চণ্ডীর দাদা বললেন—হ্যাঁ তাই তো। চণ্ডীর গলা বলেই মনে হচ্ছে। চণ্ডী—চণ্ডে—

কিন্তু সে ডাকের কেউ সাড়া দিলো না, আওয়াজও থামলো না। এতে রহস্যটা আরও ঘোরালো বোধ হতে লাগলো। আমারও জেদ চাপলো, শেষ দেখতেই হবে।

আমি ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে, বারান্দা পার হয়ে ঘরখানার চৌকাঠের ধারে পৌঁছোতেই কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠলো—এসো-এসো—বড়ো অন্ধকার—ওঃ—ছেড়ে দাও—।

'আমি চীৎকার করে বললাম—চণ্ডীকে পাওয়া গেছে—এসো—ঐ যে, কথা বলছে—।

'আমার কথা শুনে সকলে পেছনে এসে দাঁড়ালো। আমি সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না, কয়েক পা গিয়েই সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দেখি, গর্তের ভেতর একটা লম্বা কঙ্কালের, অন্ততঃ সাতফুট লম্বা, বুকের ওপর চণ্ডী কাৎ হয়ে পড়ে ভুল বকছে, আর কঙ্কালটা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। অন্য সকলেও ইতিমধ্যে এসে গর্তটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো। কঙ্কালটার প্রকাণ্ড মাথা, চক্ষুহীন কোটর, বত্রিশ পাটি দাঁত, বড়ো চোয়াল—কিন্তু আর মোটেই বলতে ইচ্ছা হয় না আমার—

সকলে বলে উঠলো—বলো, বলো, থেমো না—

'শচীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—সেই কঙ্কালের বুক থেকে বহু কষ্টে চণ্ডীকে উদ্ধার করে নিয়ে আমরা চাঙড়ীপোতায় আবার ফিরে এলাম!

নারায়ণ জিগ্যেস করলে—সেই কাৎলা মাছটা? শচীন সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমি সেই দিনই দুপুরে কলকাতায়

চলে আসি। মনটা বড়ো খারাপ। রাতের বেলা তেতলার ঘরে দরজা ভেজিয়ে একা বসে চণ্ডীর কথা ভাবছি। জানলার বাইরে নারকোল গাছটা বাতাসে সরসর্ করছে। হঠাৎ হুস্ করে দরজাটা খুলে গেলো। ফিরে তাকিয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে চণ্ডী! তার হাতে প্রকাণ্ড একটা কাৎলা মাছ। মাছটা তখনো নড়ছে! নিমেষে বুঝলাম, চণ্ডী আর নেই! চণ্ডীর মূর্তিটা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেলো। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।' বলে শচীন চুপ করলো।

নিস্তব্ধ ঘর; বাইরেও তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেলো। সকলে সে দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠলো—চণ্ডী—চণ্ডী এসেছে—চণ্ডী!

চণ্ডী ঘরে ঢুকেই বললে—শচীদা, তোমাকে খুঁজতে এখানে—

শচীন ততক্ষণে স্প্রীংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ফরাস থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিলো। চণ্ডীকে আর না এগোতে দিয়ে খপ করে এক হাতে তার একখানা হাত চেপে ধরে আর একহাতে একজোড়া স্যাণ্ডেল কুড়িয়ে নিয়ে সে চণ্ডীকে টানতে টানতে বললে—শীগগির বেরিয়ে আয়—

ক্ষিতীশও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠলো—আরে আরে, আমার একপাটি স্যাণ্ডেল নিয়ে গেলো যে। এ যে দুটোই বাঁ পায়ের—

পূর্ণ বললে—ব্যস্ত হয়ো না; ও আবার আসবার পথ করে গেলো!

রাস্তা দিয়ে তখন একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি যাচ্ছিলো। সকলে শুনতে পেলো শচীন চীৎকার করে বলছে। এই, রোখো—। বাগ-বাজার—হ্যাঁ—হ্যাঁ—চালাও জলদি—'

তারপরই গাড়োয়ানের গলার ও চাকার দ্রুত চলার আওয়াজ পাওয়া গেলো—টি-টি—গড়্—গড়্—গড়্।



টংকার অ্যাডভেনচার

ছেলেটার ইস্কুলের খাতায় ভাল নাম একটা আছে। কিন্তু তা সিন্ধুকে রাখা ভাল পোশাকের মতো খাতাতেই থাকে, কেউ আর ব্যবহার করে না, টংকা বলেই ডাকে। মানুষের এই একমাত্র সম্পত্তি যা সে নিজে ব্যবহার করতে পারে না, ব্যবহার করে অপরে, তাও যথেচ্ছ।

খেলার সাথীরা তার শৌর্য-বীর্যে মুগ্ধ হয়ে ডাকে, 'টনকো' বলে, যাদের বাড়ি থাকে সেই মামা-মামী বলে, ঠক্কা, আর, মা ও দিদি বলে, টংকু। টংকু যাত্রা করছে দিদির বাড়ি। টংকারও আর বোন নেই, দিদিরও আর ভাই নেই, আর ওদের মায়েরও ঐ দুটি ছেলে-মেয়ে ছাড়া আর সন্তানও নেই, থাকে মামার বাড়ি। মামা ভাত-কাপড় দেয়, পড়ায়, আর দুরন্ত ছেলের ভাগ্যে যা পাওনা হয়, তারও গ্যামে ও কেজিতে শোধ নেয়। তবু ছেলেটা ঢিট হয় না, যেন লোহা, পোড়ায়-পেটায় আরও শক্ত হচ্ছে।

সেই টংকা চলেছে দিদির বাড়ি। পুজো আসছে যে! মা তাকে অনেকদিন দেখেনি, গিয়ে দেখে আসা মানে এক গোছা এক টাকার নোট উড়িয়ে দেওয়া। তারও যোগাড় হয় না। দিদিও মা-ভাইকে অনেকদিন দেখেনি, আসারও সুবিধা নেই। দুপক্ষেই দেখার আকুলতা জেগেছে। তাই টংকা চলেছে দিদিকে দেখতে ও দেখা দিতে। তাকে দেখে, তার মুখে মায়ের কথা শুনে দিদি কিছুটা শান্ত হবে। আর, টংকা ফিরে এলে তার মুখে মেয়ের খবর-বার্তা জেনে মা চোখের জল মুছবে। আর—কিন্তু টংকার মায়ের মনের কথা লিখে কি হবে? কটা ছেলে-মেয়েই বা মায়ের মনের দিকে তাকায়? টংকার কথাই বলি—

টংকা সাবানে কাচা হাফপ্যাণ্ট, হাফশার্ট ও খড়ি মাখানো কেডস্ পরে, চুল আঁচড়ে, পিঠে কিট ব্যাগটা—লং জাম্পে প্রাইজ পাওয়া—ঝুলিয়ে রেডি। যেন ঘোড়া—দৌড়ের তেজী ঘোড়া, ছোটবার জন্যে অস্থির। বলে, 'মা, দেরি করছো কেন? তোমার ঐ কটা নারকোল নাড়ু খাবার জন্যে দিদি হাঁ ক'রে বসে আছে! বাঁধ—বাঁধ—শিগগির বাঁধ। কিট ব্যাগে আর জায়গাও তো নেই। নাও, পোর। এই আমি বলে দিচ্ছি, রাস্তায় আমার ক্ষিদে পেলে ওর অর্ধেক সাবাড়।'

মা বলেন, 'তোমার জন্যে চিঁড়ে, তাল পাটালি তো দিইছি। সে আমার হাতের নাড়ু খেতে ভালোবাসে—'

টংকা বলে, 'চিঁড়ে-পাটালির অর্ধেকের বেশিই তো তার। নাড়ু কি আমি খেতে জানিনে? আদুরে মেয়ের জন্যে নাড়ু পাঠানো হচ্ছে আর আমি নাড়ু গোপালের মতো নাড়ুটি হাতে করে নিয়ে গিয়ে তাকে দেবো না?'

মামা এসে ধমক দেন, 'যাবার সময়ে কেন গোল করছো? খবরদার! পথে কারো সঙ্গে মারামারি করো না।'

মা বলেন, 'সাবধানে পথ চলবে, পৌঁছে চিঠি দিও। দুগ্‌গা দুগ্‌গা!'

টংকা যাত্রা করে। তার মনে মহা আনন্দ। প্রথমে রেল, তারপর মোটর-বাস। সারাদিন পথ চলা, পৌঁছতে সেই বেলা শেষ। সে দিদির বাড়ি গিয়েছিল একবার। মনে পড়ছে, শালবনের মাথায় তখন সূর্য ডুবছে, কালো মেঘের কোলে কোলে ছড়িয়ে গেছে গলা সোনা। সেদিন ছিল ষষ্ঠী। মাঠের ওপর দিয়ে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে ড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং। আবার, সেখানে! ওখানে ভারি মজা হয়—যাত্রা হয়, থিয়েটার হয়, সং বেরয়। দিদি লিখেছে, এবার বায়স্কোপ দেখানো হবে, থিয়েটারও হবে, তবে যাত্রা আর সং মনে হচ্ছে বাদ যাবে। টংকা মনে মনে বলে, 'যাক, থিয়েটার আর বায়স্কোপই সকলে ভালোবাসে।'

টংকা চলেছে। হঠাৎ কে ডাকে, 'এই টন্‌কো! এত সকালে মান্‌জা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস রে? আরে বাপস্‌! হাতে আবার লাঠি, যেন বয়স্কাউট। লেফ্‌ট—রাইট! লেফ্‌ট—'

টংকা দেখে, বটু তাদের বার-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁতন মুখে হাসছে।

টংকা বলে, 'সাট্‌ আপ্‌।'

'ইল্লি—'

'সাট্‌ আপ্‌ আই সে—'

অমনি পিছন থেকে শোনা যায়—'টনকো দি মাইটি, কোথা যাও ভাইটি?'

টংকা পিছনে না তাকিয়েই বুঝতে পারে, কে বলছে। ও হচ্ছে সুরেশ। ও মুখে মুখে ছড়া আর কবিতা তৈরি করে। ইংরেজীর স্যার ওকে ঠাট্টা করে বলেন, 'কোনব্রিজ।'

টংকার রাগ হয়। যাবার সময় এমন করে পিছু ডাকলে পথে একটা মন্দ কিছু ঘটে যদি! কিন্তু মনের রাগ মনেই চেপে আরও তাড়াতাড়ি হাঁটে। পাড়াটা ছাড়াতে পারলেই হয়। সামনেই বাজার। সেখান দিয়ে মোটর-বাস যায় স্টেশন অবধি।

পিছন থেকে কানে আসে, 'লেফ্ট—রাইট—লেফ্ট। কুইক মারচ্—'

'চলে টংকা
নাহি শংকা
বাজে ডংকা—'

বাকিটুকু শোনা যায় না। রক্ষা যে সাথীরা অনেকেই এখনও বিছানায়। টংকা পাড়া ছাড়িয়ে বাজারে পৌঁছে দেখে বাস চলে যাচ্ছে। বাজার থেকে রেল স্টেশন দেড় মাইল। বাস-স্ট্যাণ্ডে সময়টা জেনে নিয়ে মনে মনে হিসেব করে দেখে, হেঁটে গেলেও সে গাড়ি ধরতে পারবে। সে হেঁটেই যাবে; বাস ভাড়াটা বাঁচবে। তাই দিয়ে দিদির জন্য কিনবে টিপ। দিদি কাঁচ পোকার টিপ পরতো। তার ফর্সা, ছোট কপালখানিতে কি সুন্দর মানাতো। তুপাশ থেকে সিঁথির কালো চুল নেমে এসেছে, মাঝখানে টিপ, যেন সরস্বতী ঠাকরুণ। টংকা ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে দিদির জন্য কাঁচ পোকা ধরে এনে দিত। দিদি নেই, আর ধরে না। একবার ভাবলো, এখন যদি একটা কাঁচ পোকা বা সোনালী পোকা পেত। কিন্তু এ যে বাজার। এরপর ধান ক্ষেত। ওরা বেড়ায় ঝোপে-ঝাড়ে। দিদি তাকে ভালোবাসতো। সে মনে বেদনা বোধ করে।

বাজারের বেশির ভাগ দোকানই তখন বন্ধ। তাই টিপ আর কেনা হয় না। ভাবলে, সময় থাকলে স্টেশনের বাইরে যে তু-খানা মণিহারীর ছোট দোকান আছে, সেখানে চেষ্টা করবে, বাজার ছাড়িয়ে মাঠে পড়বার মুখেই একটা মোটা গলা প্রায় পিছন থেকে বলে ওঠে, 'তংকা নয়? ভোরে উঠেই হৈ—হৈ করতে বেরিয়েছো?'

টংকা ফিরে দেখে নন্দার ছোট খুড়ো। লোকটাকে ছেলেরা কেউ পছন্দ করে না। জবাব দেয়, 'আপনিও এত সকালে এদিকে যে?'

'আমরা কাজে ঘুরি।'

'আমারও কাজ আছে।'

'তোমার মামাকে খবর দিচ্ছি গে—'

'বলবেন টংকাকে স্টেশনের দিকে যেতে দেখলাম।'

বলতে বলতে টংকা মাঠে পৌঁছয়। ওপরে শরতের ভিজে নীল আকাশ, পাল পাল সাদা-কালো, ছোট বড় মেঘ ভেসে চলেছে, যেন সওদাগরদের নৌকো ; না না, প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসছে। দুপাশে জলভরা আমনের ক্ষেত, মাঝে মাঝে জলা, শালুক ফুটে আছে, বাঁশের মাথায় মাছরাঙা, কূলে বক। কী গভীর ভাবনা ওদের। ঐ শোনা যায় গাংচিলের ডাক—কে রে! কে রে! পথে জলকাদা। বিপরীত দিক থেকে একখানি গোরুর গাড়ি আসছে, হাঁড়ি-পাতিল বোঝাই। পিছন থেকে কারা কথা কইতে কইতে এগোচ্ছে। বোধহয় রেলের যাত্রী। সকলকে রাঙিয়ে দিয়েছে সোনার রোদ। টংকার ভারি আনন্দ হচ্ছে।

দূরে দেখা যায়, রেল লাইনের উঁচু বাঁধ কাশ ফুলের পাড় দেওয়া, ঐ সিগন্যাল, ঐ—আরে! গাড়ি আসছে না? ঐ তো ধোঁয়া! হাঁ—হাঁ—গাড়িই বটে! টংকা ছুট দেয়। সে ছোটে আর ধোঁয়ার দিকে তাকায়। ঝাঁকি লেগে কিট ব্যাগের স্ট্র্যাপ গেল খুলে। ব্যাগটা কাঁধে নিয়েই ছোটে। ছুট্—ছুট্—টংকা—আজ রেল গাড়ির সঙ্গে পাল্লা। ঐ ইঞ্জিন! ঐ সাদা বাষ্প বেগে উঠছে। ইঞ্জিন সিটি দিলে—ভোঁ—ও—ও…! কানাডার ইঞ্জিন। সিগন্যালের কাছাকাছি এসে থামলো—লাইন ক্লীয়ার নেই! টংকা তবু থামে না। যেমন পেটের মধ্যে, তেমনি ব্যাগের মধ্যে সব তোলপাড় হচ্ছে! নাড়ুগুলো হয়তো এতোক্ষণে তালগোল পাকিয়ে ময়দার তালের মতো হয়ে গেছে। দেখে দিদি ভাববে, আমি খেয়েছি, পাছে টের পায় সেজন্যে ঐ দশা করে রেখেছি। বাস-স্ট্যাণ্ডের লোকটা তাকে ঠকিয়েছে। আর, তার দুই সাথী পিছু ডেকে এই অনর্থ বাধিয়েছে। ফিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করবে।

কিন্তু স্টেশনও আর বেশি দূরে নয়, গাড়িখানা হঠাৎ সিটি দিয়ে ধ্যেৎ ধ্যেৎ শব্দে যেন ধমকাতে ধমকাতে স্টেশনে এলো কিন্তু দাঁড়ালো না, হুড় হুড় করে চলে গেল!

টংকার মনে পড়লো, ওটা ডাকগাড়ি। এর পরই আসবে প্যাসেঞ্জার গাড়ি। তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। সে স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কেটে প্লাটফরমে গিয়ে দাঁড়ালো।

তারপর—

যখন তার গন্তব্য স্টেশনে গাড়ি থেকে নামলো তখন বেলা ডুবু—ডুবু। গাড়ি এর আগেই পৌঁছয়, কিন্তু লাইন মেরামত ও বদলানো হচ্ছে। তাই থামতে থামতে এসেছে। এবং দেরী হয়েছে প্রায় পৌণে একঘণ্টা।

সে ফটকে টিকিট দিয়ে বেরোতে যাবে, টিকিট-কালেক্টার তাকে বললে, 'এ কার টিকিট ?'

টংকা অবাক হয়ে বলে, 'কেন, আমার ?'

'তুমি কি চাইল্ড ?'

'মানে—?'

'এখন থেকেই জোচ্চোরি শুরু করেছো ? তোমার বয়স বারো বছরের নিচে ?'

'আলবৎ।'

'কভি নেই! বারো বছরের ছেলের বুকের ছাতি অমন চওড়া হয় ? সে কি তোমার মতো লম্বা হয়ে থাকে ? তার হাত-পায়ের গুলি অমন পুষ্ট ? চালাকির আর জায়গা পাওনি ! আমার চোখে ধূলো দেবে ? রোজ কত প্যাসেঞ্জার পার করি জান ? চল ওদিকে—'

'যাব না।'

'পুলিসে দেবো।'

ইতিমধ্যে ছুটি সেপাই ও একটি কৌতূহলী জনতা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেই হাসছে।

টিকিট-কালেক্টার আবার বলে, 'ভালো চাও তো পেনালটি শুদ্ধ বাকি ভাড়া দাও।'

টংকা বলে, 'মশাইয়ের বয়স কত ?'

'আবার ইয়ারকি !'

'দয়া করে বলুন না।'

'ত্রিশ বছর।'

'কখনও না। আপনার বয়স বিশ বছরের বেশি নয়।'

শুনে জনতা হেসে ওঠে।

টংকা আবার বলে, 'ত্রিশ বছরের যে সে একটা আস্ত মানুষ হয়, আপনার মতো আধখানা নয়।'

আবার জনতা হাসে।

একজন সেপাই বলে, 'এ খোঁখা ! তুম বহুৎ চাঁলাক হো।'

টিকিট-কালেক্টার বলে, 'তুমি পড়? কোন ক্লাসে? এইটে? ঠিক বলছো? কোথায় যাবে?'

'পলাশপুর।'

'কার বাড়ি?'

'বোসেদের।'

'রতন বোসকে চেন?'

'হাঁ।'

'তুমি তার কে হও?'

'তিনি আমার বোনাই।'

'তুমি তার কে হও বললে না তো!' বলে টিকিট-কালেক্টার হাসে। তারপর আবার বলে, 'সে আমার বন্ধু। তুমি তার শ্যালক। অতএব—'

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে, 'কুটুমের ভাড়া লাগে না। কশুর মাফ। আমরা হলে এতক্ষণ—'

টিকিট-কালেক্টার বলে, 'কিন্তু এখন তো পলাশপুরের বাস নেই, চলে গেছে। এর দু'ঘণ্টা পরে আবার যে দুখানা গাড়ি, আপ-ডাউন, আসবে তার জুড়ি বাস পাবে। চল, ততক্ষণ বিশ্রাম করবে।'

কিন্তু টংকার আর ধৈর্য থাকে না। সে বলে, 'আমি হেঁটেই যাবো।'

'বল কি হে? দেড় ক্রোশ পথ, তাও আবার শালবনের মাঝ দিয়ে, তোমার মতো ছোট ছেলে একা যাবে?'

'গেলে কি হবে?'

'সন্ধ্যের পরে ও পথে কেউ একা চলে না, ঠ্যাঙাড়ে আছে।'

'এখনও বেলা আছে। দেড় ক্রোশ পথ পৌণে একঘণ্টায় পৌঁছে যাবো।'

'গোঁয়ার্তুমি কোরো না ছোকরা।'

'আমার কাছে পয়সা-কড়ি বিশেষ কিছু নেই।'

'তাতে কি? ওরা একখানা নতুন গামছার জন্যেও মানুষ মারতে পিছয় না। চল—চল—বসবে চল—' টংকা অগত্যা তার সঙ্গে যায়। টিকিট-কালেক্টার তাকে নিজেদের ঘরে বসিয়ে চা-টোস্টের ব্যবস্থা করতে গেল। ফিরে এসে দেখে, টংকা নেই! এদিক-ওদিক খোঁজে।

টংকা ততক্ষণে রেললাইনের পাশ থেকে কতকগুলো পাথর কুড়িয়ে প্যান্টের দু' পকেটে বোঝাই করে নিয়ে পথ দিয়ে হন্-হন্ করে হেঁটে চলেছে। উত্তেজনায় তার ক্ষুধাও চাপা পড়ে গেছে। স্টেশনের ধারে বাজার ও বসতি। তার চলার পথের পাশে একটা মণিহারির দোকান পড়ে। টংকা টিপ কিনতে যায়। কিন্তু কাঁচ পোকার ময়ূরকণ্ঠী রং বা সোনালী পোকার সেই জেল্লা কোন টিপই দেখতে পায় না। তারই মধ্যে যা ভালো তাই কেনে। ওদিককার বাসভাড়া বেঁচেছে, এদিককারও বাঁচলো। সুতরাং পয়সার অভাব হয় না।

ক্রমে বাজার-বসতি ছাড়িয়ে ফাঁকাপথে এসে পড়ে। দুপাশে ঘন সবুজ শাল-মহুয়া বন শরতের হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। মাঝ দিয়ে পীচঢালা কালো পথ যেন একখানি ঝকঝকে রিবন চলে গেছে কোথায় কে জানে? পথটা উঁচু-নিচু। একটিও মানুষ দেখা যায় না। কী নির্জন। থেকে থেকে বুলবুল ডাকছে, যেন সেতার-ঝঙ্কার। একটা ঘুঘু যেন কোথায় বসে করুণ সুরে ডাকছে—এস, এস। প্রচুর শব্দ করতে করতে একখানা স্কুটার চলে গেল।

বিপরীত দিক থেকে তীরের মতো হিস্-হিস্ শব্দে ছুটে এল বিস্কুট রঙের একখানা পান্‌সি মোটর। টংকা চলেছে। তার মনে হচ্ছে, সে ভারি নিঃসঙ্গ, বড় একা। রেলগাড়িতে বসে কিট-ব্যাগের বাকল্‌সটা ঠিক করে নিয়েছিল। এখন সেটা কাঁধে ঝুলছে। তার হাতে বাঁশের লাঠি, প্যান্টের দু' পকেটে পাথর।

তার সামনে-পিছনে যতদূর দেখা যায় জনমানব নেই। ওদিকে সূর্য ডুবছে, গাছের ছায়া গাঢ় হচ্ছে, বনতল অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে, ঝিঁঝিঁগুলোর ঝঙ্কার যেন মাটি ফুঁড়ে উঠছে। আর, দিনের আলো নেববার আগেই বুলবুল তার শেষ গান গেয়ে নিচ্ছে।

টংকা দুভাগ পথ পার হয়ে এসেছে, আর একভাগ বাকি। পথটা সেখানে খানিক ওপরদিকে উঠেছে। সে দেখলে, পথের ধারে দুটো লোক উবু হয়ে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দেখে তারও বুকের ভেতর কেমন করে উঠলো, ডানহাতখানা আপনিই প্যান্টের পকেটে ঢুকে একখানা পাথর চেপে ধরলো।

সে লোক দুটোর কাছাকাছি পৌঁছতেই তারা উঠে দাঁড়ালো। এবার সে পরিষ্কার দেখলো, তাদের হাতে মোটা লাঠি। তাদের একজন টংকার পিছন দিকে চট্ করে সরে এল।

সামনের লোকটা ভাঙা গলায় বললে, 'তুই কোথা যাবি রে?'

লোকটার চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল।

টংকা বলে, 'পলাশপুর।'

'তোর কাছে কি আছে, দে—'

'এই নাও,' বলে টংকা ধাঁ করে লোকটার মুখে পাথর ছুঁড়ে মেরেই দৌড়।

লোকটা 'ওরে বাবা রে' বলে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে নামলো রক্তের ধারা।

টংকার পিছনের লোকটা তার পিছনে ছুটলো। কিন্তু সে মাত্র হাত কয়েক গিয়েই টংকার পা লক্ষ্য করে হাতের লাঠিখানা ছুঁড়ে দিলে। লাঠি লেগে টংকা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে তার হাতের

লাঠিতে ভর দিয়ে টাল সামলে নিলে। এমন সময়ে পিছনে ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ—টংকা ফিরে দেখে তীরবেগে একখানা জীপ আসছে। সে থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু সেই লোক দুটো শালবনে অদৃশ্য।

জীপখানা এসে টংকার পাশে থামলো। জীপে ছিল চারজন শিকারী। তাদের হাতে বন্দুক। দুজন তড়াক করে লাফিয়ে নেমে জিগ্যেস করলে, 'দূর থেকে বাইনাকুলার দিয়ে আমরা সব দেখেছি। তুমি কে? ওরাই বা কে?'

টংকা বলে, 'ওরা ঠ্যাঙাড়ে। আমি এ অঞ্চলে থাকি না, যাচ্ছি আমার দিদির বাড়ি, পলাশপুর।'

'একা এ পথে কেন? কেনই বা হেঁটে যাচ্ছ? আচ্ছা, গাড়িতে ওঠ। সব শোনা যাবে। আমরা ঐ দিকেই যাচ্ছি শিকারে। পথে পলাশপুরের বাজারের ধারে তোমায় নামিয়ে দেবো। পথ চিনে যেতে পারবে?'

টংকা বলে, 'হাঁ।'

গাড়ি চলেছে। শিকারীদের একজন বলে, 'স্মার্ট বয়। ওদের একটা ঘায়েল হয়েছে দেখেছি। কি দিয়ে মেরেছো?'

'পাথর। এই যে' বলে টংকা পকেটের পাথর দেখায়।

তারা হো-হো করে হাসে।

গাড়ি পৌঁছয় পলাশপুর বাজারে। কাছেই টংকার দিদির বাড়ি। বেশ মনে আছে, সামনের ফটকে উঠেছে মাধবীলতা, বাড়ির পিছনে একসারি নারকোল গাছের ঝাঁকড়া মাথা দেখা যায়।

তখন সন্ধ্যা। টংকা ফটক খুলে বাগানে ঢুকতেই একটা কুকুর ডেকে ওঠে, আর একটা মোটা গলা বলে, 'কে?'

টংকা বারান্দার সামনা-সামনি হতেই লোকটা বলে ওঠে, 'আরে বড়কুটুম যে! আকাশ থেকে পড়লে নাকি? আমি তোমার জন্যে বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখতে পেলাম না কেন? আর পেন্নামের দরকার নেই। ভেতরে চল—'

লোকটি টংকার বোনাই।

টংকা ভেতরে যায়, দিদি আসে। মুখে মিষ্টি হাসি। বলে, এসেছিস? মা কেমন আছে? তোর এত দেরি হলো যে? পথে কোথাও নেমেছিলি নাকি?'

টংকা পায়ের ধূলো নিতে নিতে বলে, 'কোথাও নামিনি। মা ভালো আছে।'

কিন্তু তার পৌঁছতে কেন দেরি হলো সে কথা জানবার আগ্রহ আদর-আপ্যায়নের ব্যস্ততায় চাপা পড়ে। অথচ পথের ঘটনা বলবার জন্যে তার মন ভারি অস্থির। সেই শিকারীরাও তার শৌর্যবীর্যের তারিফ করেছে। সে যে টিপ কিনবার পয়সা জোগাড় করতে দু' দুবার লম্বা পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছে! দ্বিতীয়বার জানও কবুল করেছিল! এসব কথা বলার জন্য তার মন ছটফট করছে।

সে কিট-ব্যাগটা দিদির হাতে দিয়ে একটু রুক্ষভাবে বলে, 'খুলে দেখ, মা কি সব পাঠিয়েছে।'

'দেখবো পরে। তুই হাত মুখ ধুয়ে আয়। ঐ যে কুয়োতলা—'

বোনাই বলে, 'তোমার পকেটে খট্‌খট্ করছে কি হে?' লাট্টু নাকি?'

টংকা একে একে বার করে মেঝেয় ফেলতে থাকে।

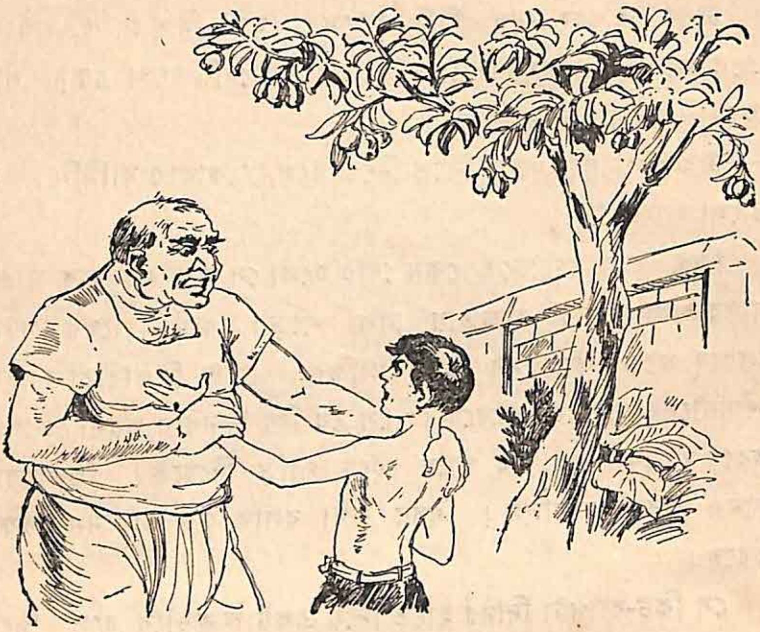
বোনাই বলে, 'কি ব্যাপার? পাথর কেন?'

এবার টংকা পথের ঘটনাটি বলে যায়। বলে যায় মন খুলে।

শুনে দিদি কিন্তু গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে, 'ওমা! কী সাংঘাতিক! আমি মনে করেছি টংকু বুঝি শান্ত হয়েছে। এখনও তেমনি ডানপিটে আছিস্?'

টংকা দেখে, দিদির কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। সিঁথিটা ওপর দিকে উঠেছে। দিদি বদলে গেছে। তার কপালে টিপ দিতেই তো এত কাণ্ড দিদি যদি বুঝতো!

কিন্তু বোনাই বলে, 'সাবাস!'



ক্যাপটেন বনমালী

লোকের নাম যে কত রকমের হতে পারে তা কল্পনায় আনা যায় না। সব নামের মানে না থাকলেও নাম-করণের একটা কারণ থাকবেই। সুবিধা থাকলে, মানে, জায়গা পেলে দু'দশটা উদাহরণ দিয়ে আমার কথা প্রমাণ করতাম। কেবল একটার কথাই লিখি।

সেদিন বলাই ঢোল মশাই খুব বিরক্ত হয়ে একটি আট দশ বছরের ছেলের হাত খপ করে চেপে ধরে বলে উঠলেন, "তোকে থানায় দেবো। বল্, তোর নাম কী?"

থানার মতো ভালো জায়গায় দেওয়া হবে, বোধ হয় সেই আনন্দেই ছেলেটি বললে, "নলী।"

"কী?"

"নলী।"

"তোকে নলের মতো দেখতে নয়, গলায় নলীর মতো বগাও

বেরিয়ে নেই, তবে তোর নাম নলী কেন ? নল তৈরি করিস্ বলে—অ্যাঁ ? না বললে থানায় দেবো।"

এই এক মুশ্‌কিল! লোকে বরাবর এক কথা বলে না ছেলেটা কয়েকটা পেয়ারা, তাও পাকা নয়, ডাঁশা নয়, একদম কস্‌টে, চুরি করেছে বলে ঢোল মশাই একটু আগেই তাকে থানায় দিতে যাচ্ছিলেন। এখন আবার নাম-করণের কারণ না বললে থানায় দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ছোট্ট ছেলের তো পাকা সমালোচকের মতো বুদ্ধি হতে পারে না। তাই সে ঢোল মশাইয়ের কথার মধ্যে গরমিল ধরতে না পারলেও মনে করলে, নামকরণের ইতিহাসটুকু বললেই ছাড়া পাবে। পেয়েই ভোঁ দৌড় একেবারে ঐ ঝিলের ওপারে।

ছেলেটি বললে, "আমার ভাল নাম বনমালী।"

ঢোল মশাই হুম করে উঠলেন, "হুম্—বনমালী থেকে নলী!" এবং চোখ দু'টো একবার ঘোরালেন। কেন কে বলবে ? লোকের মনের কথা কে জানে ? মনে হয়, নাম ছোট করার কারণগুলো মনে মনে একবার নাড়াচাড়া করলেন। কিন্তু সব প্রশ্নের ঠিক উত্তর কী পাওয়া যায় ?

ঢোল মশাই আবার বললেন, "বনমালী ? অ্যাঁ ? বনমালী থেকে নলী ; কেন তোকে নলী বলে বল্ ? বোনা বা বুনো বলে না, মালী বা মলা বলেও ডাকে না। নলী বলে কেন ? না বললে তোকে—" বলেই তার হাতে জোরে এক ঝাঁকি দিলেন। তাঁর রাগ তখন খুব। গাছের ফল চুরি করলে—নিজেও ছেলেবেলায় এই কাজটি করে থাকলেও—কার না রাগ হয় ? তার ওপর চোর ধরা পড়েছে এবং তার নামকরণের কারণ বলতে পারছে না।

ছেলেটি এবার বেশ সহজভাবেই বললে, "আমার ছোটকাকা বোনাপার্টের ওপর খুব চটা। বলেন, বোনা বললে বোনাপার্টের কথা মনে আসে আর রাগে গা জ্বালা করে।"

শুনে ঢোল মশাই হাঁ, বললেন, "নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যিনি

জগদ্বিখ্যাত বীর, ফরাসী জাতির গৌরব, ইংরেজকে সাতঘাটের পানি খাইয়েছেন, মহানদাতা, মহানুভব ব্যক্তি, তাঁকে তোর কাকা—"

নলী বললে, "সে ঢাকা উল্টে ফেলে দিয়ে দুধ মাছ চুরি করে খায় যে!"

"ঢাকা উল্টে ফেলে দুধ মাছ খায়? মানে?"

"আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে। ওদেরই পোষা হুলো—নাম বোনাপার্ট।"

এক যুগের মহাবীরের আর এক যুগে কী পতন!

ঢোল মশাই ঢোঁক গিললেন, বললেন, "বুঝলাম। তাহলে মালী বলে না কেন? বাগানের মালীকে মনে পড়ে বলে?"

"হুঁ।"

"ব—টে। কিন্তু তোর শয়তানের মতো চোখ আর স্বভাব যে রকম তা'তে তোকে বুনো বলাই ঠিক। ছাড়া হবে না। তোকে থানায় দেবোই। অমন কাশীর পেয়ারা গাছটা! ডাল ভেঙে, পাতা ছিঁড়ে, জালিগুলো পেড়ে আমার সর্বনাশ করেছিস। তোর সঙ্গে কে কে ছিল? গেল কোথায় তারা? সবাইকে থানায় দেবো। তারা কার ছেলে? বল্, বল্ শীগগির?"

নলী এদিকে ওদিকে তাকায়। কাছে কিনারে কেউ নেই। রাস্তা ফাঁকা। বাগান খালি। ছুটির দিন—ভর্-দুপুরে পল্লীর সবাই ঘুমোচ্ছে! কেবল কতকগুলি শান্তশিষ্ট বালক পথে পথে ঘুরছে, কারো বাগানের ফল-ফুলের দফারফা করছে, কারো টিউবওয়েল ভাঙছে, কারো আধা তৈরি দালানের সিমেন্ট খুঁড়ছে, ইট খুলছে, ভারা নামাচ্ছে এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সোল্লাসে কলরব করে উঠছে। যেন তারা পিতৃমাতৃহীনের দল—বন থেকে লোকালয়ে এসেছে—সন্ধ্যে হলে আবার বনে গিয়ে ঢুকবে। নলী এদেরই ক্যাপ্টেন। সে ধরা পড়তেই সকলে হাওয়া।

ঢোল মশাই শব্দ করলেন, "রাধেশ্যাম—রেধো—ও!"

রাধেশ্যাম চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে এসে দাঁড়ালো। কালো, শুঁটকো, ঢ্যাঙা লোকটা ঢোল মশাইয়ের চাকর। ঢোল মশাই বললেন, "খোকাবাবুকে ডাক্ তো।"

রাধেশ্যাম ভেতরে গিয়েই তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো ; বললে, "তিনি নেই।"

ঢোল মশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, "নেই ? কোথায় গেল ? ঠিক দেখেছিস্ ?"

"আজ্ঞে। এই ছোকরাটা এসে ওদিকে বেড়ার ধার থেকে শিস্ দিতেই তিনি বেরিয়ে গেল।"

"কী ! এই শয়তানগুলোর দলে সেও আছে ? তোরা আমার নাতিরও মাথা খাচ্ছিস্—দাঁড়া। তোদের সব ক'টার—" কিন্তু কী যে তিনি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। কেবল রাগে কাঁপতে লাগলেন।

তারপর যা ঘটলো সে কথা পরে লিখছি। তার আগে লিখি—ঢোল মশাইয়ের বাড়ির সামনে সরকারী রাস্তা। রাস্তার পর ঝিলের মত একটা লম্বা পুকুর। পুকুরের ওপারে বস্তি। বস্তির ফাঁকে ফাঁকে পেঁপে, কলা, কুল ও বকফুলের গাছ বাদলের ছায়ায় ও ঝির্‌ঝিরে ধারায় তাজা ও গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। ঢালু পাড়ে কচু, থানকুনি ও শান্তি লতার বন। তার মাঝে কালকাশুন্দি ও ভাঁট। চারধারে কূলে কূলে কলমী, হেলঞ্চ ও শুশনী যেন আয়নায় লতা-পাতা বসানো ফ্রেম। জলের ঘোলা রং কেটে স্ফটিকের মতো হয়ে আসছে। মাটির রঙে রং মিলিয়ে দু-একটি বক সারাদিনই বসে মৎস্য-সাধনা করছে। মাছদের খেলার দিন এসেছে। তারা সারা পুকুরে খেলেও বেড়াচ্ছে। বাদলের ভিজে বাতাস ঠাণ্ডা বাতাস ফুসফুসে টেনে নিতে মাছগুলো জলের ওপরে ভেসে উঠেই আবার ডুব দিচ্ছে। অমনি গোল হয়ে ঢেউ উঠে ক্রমে বড়, আরও বড়, তার চেয়েও বড় হয়ে কূলে পৌঁছেই মিলিয়ে যাচ্ছে। মেঘের একটু ছায়া পড়লেই ব্যাঙদের সরু-মোটা

স্বর শোনা যায় — ছুটি—ছুটি—আও রে—আও রে। আবার যখন বৃষ্টি ঝরে তখন সেই স্বরের কাছে কোথায় লাগে মেঘ-মল্লার গান।

এবার লিখি সেই পরের ঘটনা।

নলী ধরা পড়বার মিনিট কয়েক আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই বাইরে সব ভিজে ও পিছল।

ঢোল মশাই খালি চোখে কম দেখেন, মোটা কাঁচের চশমা জোড়া চোখে দিলে বেশী দেখেন, তবে খুব বেশী দেখেন না। কিন্তু বলেন, 'আমার চোখে কিছু এড়ায় না, সব দেখতে পাই।' পুকুরটার ওপারের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হলো যেন তাঁর নাতি খোকা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নলীর হাত ছেড়ে দিয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ও চীৎকার করে ডাকতেই সে চকিতে সরে গেল। ঢোল মশাই ঠিকই দেখলেন।

কিন্তু নলী ও রাধেশ্যাম তাঁর চেয়েও ভালো দেখলো, দেখে ঢোল মশাই বলে উঠলেন, "শালা পালালো। বাড়ি এলে কান—"

আর নলী দেখে, "ডুবলো" বলতে বলতে একলাফে রাস্তায় পড়লো। পড়েই রাস্তার ধার থেকে পুকুরে ঝাঁপিয়ে ডুবন্ত খোকার দিকে প্রকাণ্ড মাছের মতো সাঁতরে চললো।

রাধেশ্যাম চীৎকার করে উঠলো, "বাবু! খোকাবাবু জলে পড়ে গিয়েছেন। ডুবতে লেগেছেন।"

শুনেই ঢোল মশাই মহাসোরগোল করে উঠলেন। কম্পিত পায়ে পুকুরের ধার দিয়ে ঘাটের দিকে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলেন, "কে আছ। বাঁচাও—বাঁচাও—"

নিমেষে নির্জন পুকুর-পাড়, নিস্তব্ধ পল্লী জনতায় ছেয়ে গেল। কয়েকজন ঝপ্ ঝপ্ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু নলী ততক্ষণে গিয়ে পেঁাছেছে খোকার কাছে।

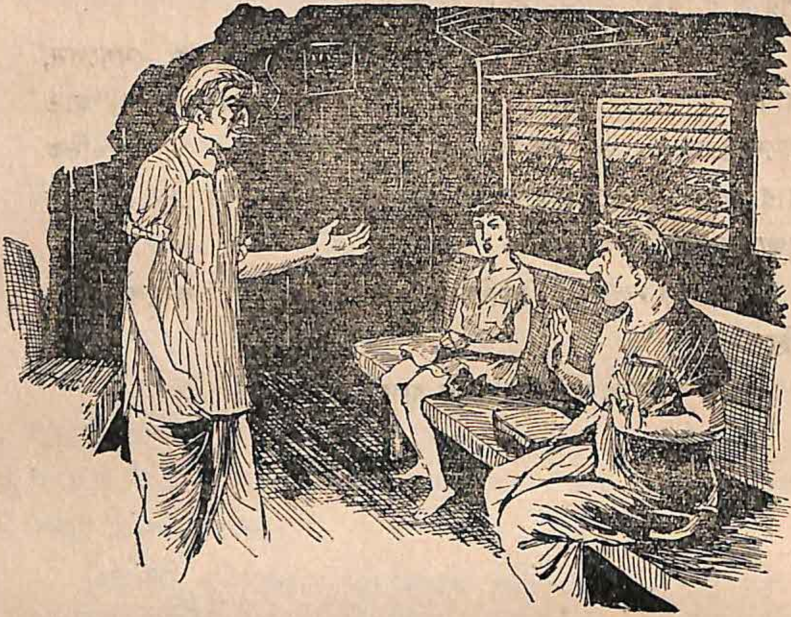
ঢোল মশাইও জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত। তাঁকে দু'জন চেপে ধরে রইলো। তাঁর ছেলে-বউ গেছে দূর বিদেশে। কাছে আছে

নাতিটি। ও যদি মরে—। তিনি আর ভাবতে পারেন না। তার পর আর কিছুই জানেন না।

পরদিন সকালে চোখ মেলে তাকালেন। ভ্রূ কুঁচকে দেখলেন, মাথার কাছে কে যেন বসে। আস্তে আস্তে তার একখানা হাত চেপে ধরলেন। কী বলতে চাইলেন, পারলেন না। এদিক-ওদিক বার কয়েক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজলেন। তার পর সেই যে চোখ বুজলেন আর তাকালেন না।

বোধ হয় নলীকে খুঁজেছিলেন, তাকে আশীর্বাদ করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু মানুষের মনের কথা কে বলতে পারে?



বিশ্বাস হয় না

বিশ্বনাথবাবু শেষ ট্রেনে ফিরচেন। তাঁরও যেন শেষ অবস্থা। সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে তাগিদ মেরেচেন। আদায় তো হলো কাঁচকলা। এখন এই টাকা কয়টি আর প্রাণটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলেই তবে তো রক্ষা। আবার ভোরে উঠেই ছুটতে হবে সেই বারাসত। বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যে কী ঝকমারি তা যার নেই সে বুঝবে না। সে সুখেই আছে।

কিন্তু যা দেখা যাচ্চে, রাত বারোটার এক সেকেণ্ডও আগে গাড়ি বেলেঘাটায় পৌছচ্চে না। উঃ! কী গরম। গাড়ি যখন ছোটে তখনই অন্ধকার-ভরা খোলা মাঠের হাওয়ার স্রোত জানলা দিয়ে হু হু করে ঢোকে, শরীর জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়। চোখের পাতা দুখানি বুজে আসে। পা দুখানা ছড়িয়ে গদির উপর খানিক শুয়ে থাকতে পারলে শরীরের ক্লান্তিটা যেত। কিন্তু এক রকম চলন্ত

গাড়িতেই লাফিয়ে উঠে যত বিপদে ফেলেচে ঐ ছোঁড়াটা। ও যে পকেটমার ওকথা বিশ্বনাথবাবু হলপ করে বলতে পারেন।

ও কী! ছোঁড়াটা দু পাশের জানলা দুটো, ওদিককার আলোটা নিভিয়ে পাখা বন্ধ করে দিলে যে! বিশ্বনাথবাবু তাকে ধমক দিতে গিয়েই নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। ও আছে কামরাটার ওদিকে। ওটা ওর এলাকা। নিজ এলাকায় পরের এক্তিয়ার নেই, থাকা উচিতও নয়, থাকতে দেওয়াও যেতে পারে না। ও যেভাবে পট পট করে সুইচ টিপলে তাতে বোঝা যায়, রেলগাড়িতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় হামেশাই যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু ঐ তো পোশাক। গায়ে আধময়লা হাতকাটা শার্ট, পরনে খাকি রঙের হাফপ্যান্ট! পা দুখানি খালি, প্রায় হাঁটু অবধি ধুলো! ও পায়ে কোনদিন যে জুতো উঠে তাতো বিশ্বাস করা যায় না। ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছে? কখনই না। হয়তো, হয়তো কি? এই তিনি সভয়ে সকৌতূহলে, সসতর্ক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন এটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বা কোন শ্রেণীরই টিকিট কাটেনি, কোনদিন কাটেও না। কাটবার দরকার মনে করে না। পয়সা কোথায় পাবে? ওদের রোজগারের কড়ি আসে পরের পকেট মেরে। তাই টিকিট না কেটে রেল কোম্পানীর পকেট কাটচে।

আরে! ছোঁড়াটা শুয়ে পড়লো যে। বটে! ফাঁদ পাতা হলো যাতে তিনিও দেখাদেখি শুয়ে পড়েন। আরে বাবা! বুড়ো হলে কি হয়? সারারাত ঠায় বসে তবিল পাহারা দিতে পারি। পয়সা এমনি এমনি ঘরে আসে না। তাতে কত বুদ্ধি খাটাতে হয়। কত লোককে ফাঁসাতে হয়। ঘুমোলে চলে? তুই ঘুমো। আমি তোকে পাহারা দি।

ভাবলেন, কোন চেকার ওঠে না গাড়িতে! বিনা টিকিটের মানে ডবলু. টি.র যাত্রীদের এত ধর পাকড়, কানমলা, নাকখৎ দেওয়া ও জরিমানার কথা কাগজে পড়া যায়। কৈ একজনকেও তো দেখা

যাচ্ছে না যে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পোরে? গাড়ি তখন একটা শুকনো খালের পোল হুম হুম শব্দে পার হয়ে মাঠ দিয়ে ছুটচে। আর চাকায় যে শব্দ হচ্ছে তাতে বিশ্বনাথবাবুর মনে হলো যেন বোল উঠচে, "ধরবে কে? সব যে চোর। ধরবে কে? সব যে চোর।" আবার যেন এক একবার বলচে, "তুই কি সাধু? ধর না তুই।" বিশ্বনাথবাবু নিজের ছেলেমানুষীতে মনে মনে হাসলেন। রেলগাড়ির চাকায়, যা মনে করা যায়, সেই রকম বোল ওঠে।

আচ্ছা, ছোঁড়াটা যাবে কোথায়? আসচে তো তাঁরই সঙ্গে ক্যানিং থেকে। ওরও গন্তব্যস্থল কি বেলেঘাটা? দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে তিনি ভুলই করেচেন। মনে করেছিলেন, সঙ্গে টাকা আছে, তৃতীয় শ্রেণীর জনতাকে এড়িয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিরালাই ভাল। এখন মনে হচ্চে, একা চলার চেয়ে পাঁচজনের সঙ্গে থাকাই নিরাপদের। অবিশ্যি, গাড়িখানার লেজা থেকে মুড়ো অবধি খুঁজলে পঞ্চাশটি যাত্রীও হয়তো পাওয়া যাবে না। আর তাদের মধ্যে ওর জুড়িদারই আছে চার পাঁচটি। পকেট-মারেরা কখন একা চলে না।

এমন সময়ে বেগ কমতে কমতে গাড়ি থমকে দাঁড়ালো। তুপাশে অন্ধকার স্রোতে তুটি-চারিটি জোনাকি ভেসে চলচে। কোন কোনটা উজানে সাঁতরে যাবার চেষ্টা করচে। দূরে, অনেক দূরে, একটা আলো দেখা যায় যেন একটি বিন্দু। পাশে কোন গাড়িতে কে কাসলে, ধপ করে একটা দরজা বন্ধ হবার ও হড়াৎ করে জানালা পড়বার শব্দ হলো। তাঁর জানলার পাশ দিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়া উড়ে চলে যাচ্চে। বিশ্বনাথবাবু ডান ধারের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইঞ্জিনের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কেবল দেখতে পেলেন, দূরে শূন্যে কয়েকটা লাল সাদা আলো। আর, সেগুলো ছাড়িয়ে মাটিতে কয়েকটা আলো ঝিকমিক করচে। তাই দেখে অনুমান করলেন, সামনেই স্টেশন। সম্ভবতঃ সিগন্যাল দেয়নি। তাই গাড়ি থেমেচে। কিন্তু এমন অবস্থায় কী

ড্রাইভারের কর্তব্য নয় ইঞ্জিনের সিটি দেওয়া ? এখন যদি ডাকাত পড়ে। যদি যাত্রীদের টাকাকড়ি বা মালপত্র কেড়ে নিয়ে এই অন্ধকারে কেউ উধাও হয়। কে তাকে ধরচে ?

পিছনে একটু শব্দ হতেই তিনি ফিরে দেখেন, ছেলেটা তাঁরই বেঞ্চির শেষ দিকে বসে আরাম করবার জন্যে সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে গাড়ির গায়ে পিঠ ঠেসান দিলে।

বিশ্বনাথবাবু এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, তাঁর গাঁটে ছুরি ও গলায় ফাঁসি পড়তে আর দেরি নেই। তবে তাঁরও গায়ে জোর আছে। এমন সময় ইঞ্জিন লম্বা সিটি দিয়ে গাড়িগুলোতে একটা হ্যাঁচকা টান মারলে। গাড়ি আস্তে আস্তে আবার চলতে আরম্ভ করলো।

বিশ্বনাথবাবু ছোঁড়াটাকে ভোলাবার চেষ্টায় স্বর মোলায়েম করে আলাপ জুড়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন,

"কোথায় যাবে ?"

"বেলেঘাটা।"

"কোথা থেকে আসচো ?" বলেই প্রশ্নটির অসারতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। কারণ, তিনি তো দেখেইচেন সে কোথায় গাড়িতে চড়েচে।

ছেলেটা সে প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না এবং তাঁকে তৃতীয় প্রশ্ন করবার আগেই ছোঁ-দিয়ে বিশ্বনাথবাবুর প্রায় পায়ের কাছ থেকে কি একটা কুড়িয়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরলে।

বিশ্বনাথবাবু ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন "কী ? কী কুড়িয়ে নিলে ?"

ছেলেটা শান্ত কণ্ঠে বললে, "টিকিট।"

"কার ?"

"আমার !"

গাড়ি চলতে চলতে হুস করে আবার থামলো।

"তোমার টিকিট এখানে এলো কি করে ?"

"হাওয়ায় উড়ে।"

তুরুক জবাবে বিশ্বনাথবাবু রেগে উঠলেন। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করলেন না। নিজের পাঞ্জাবীর ঘড়ির পকেটে আঙুল দিয়ে দেখেন টিকিট নেই! কোমরে হাত দিয়ে দেখেন, টাকার গেঁজেটা তো ঠিক আছে। পাশের পকেটেও ডায়েরিখানা খোয়া যায়নি।

নিজের মনেই বললেন "তবে আমার টিকিট গেল কোথায়?" বিনা টিকিটে রেলে চড়ার শাস্তি এই বয়সে তাঁকে ভোগ করতে হবে? না, না, সে হতেই পারে না। সামনের স্টেশনেই তিনি সব কথা গার্ডকে বলবেন। ঐ টিকিটখানা যে তাঁর সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। সেই গাড়িতে চড়েই যখন শরীরটাকে মিনিট কয়েক গদিতে এলিয়ে দিয়েছিলেন তখনই পকেট থেকে পড়ে গেচে। আশ্চর্য যে একবারও তাঁর চোখে পড়লো না। গার্ডকে বলবেন, ঐ ছোঁড়াটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরেচে। সব ঘটনা শুনলে গার্ডের বিশ্বাস হবেই। কারণ তিনি বয়স্ক ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, "ও টিকিট আমার। পকেট থেকে পড়ে গেচে। ফেরৎ দাও। না হলে বিপদে পড়বে।"

"কিসের বিপদ?"

"টিকিট চুরির।"

"আমি কারো টিকিট চুরি করিনি।"

"আচ্ছা একটু পরেই টের পাবে।"

গাড়ি তখন আবার চলচে। ছেলেটা ভ্রূ কুঁচকে তাঁর দিকে তাকালে। তারপর বললে, "টিকিটে আপনার নাম লেখা আছে? আমি সেকেণ্ড ক্লাসে চড়তে পারি না?"

"পয়সা দিলেই পারা যায়।"

গাড়ি ততক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে গেচে। বিশ্বনাথবাবু আবার বললেন, "তোমার কথাগুলো তো বেশ লম্বা চওড়া হে! অথচ তুমি মানুষটা পৃথিবীতে এসেচো চোদ্দ-পনের বছরের বেশি নয়।"

"যারা বেশিদিন পৃথিবীতে থাকে তারাই বড় বড় কথা বলবে। কী বলেন ?"

"তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই নে।"

"আমারই বা কী এমন দরকার পড়েচে ?" বলতে বলতে সে ওধারের বেঞ্চিতে গিয়েই আলো জ্বেলে, পাখা চালিয়ে দিয়ে বসে পড়লো।

বিশ্বনাথবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এ পকেটমার নয়, ডাকাত। এই বয়সে অনেক শিখেচে। তাঁকে এ ব্যাপারে হার মানতেই হলো। এখন তিনি ডবলু. টি.। ও টিকিট যে তাঁর তা প্রমাণ তিনি কিছুতেই করতে পারবেন না।

গাড়ি কিন্তু সেখানে পুরো এক মিনিট না থেমেই আবার হুস হুস করে চলতে লাগলো। এর পর চেকিং স্টেশন সোনারপুর। যত গোল বাধবে ওখানেই। কিন্তু তিনি কিছুতেই ওকে ছাড়বেন না। একটা চোরের, একটা চৌদ্দ-পনের বছরের ছোঁড়ার কাছে তিনি হার মানবেন ? কিছুতে না। তিনি কলকাতা থেকে ক্যানিং গিয়ে তাঁর পাওনা টাকা উশুল করে আনচেন। তাঁর খাতক পালিয়েও বাঁচতে পারেনি আর ও কিনা তাঁরই পকেট মেরে তাই দিয়ে গাড়ির মাশুল চুকিয়ে আরামে যাবে এবং তাঁকে গুণতে হবে দণ্ডের কড়ি ! এমন সময়ে খট করে একটা শব্দ হলো এবং উল্টো দিকের দরজা খুলে চলতি গাড়িতে তাঁরই অংশে ঢুকলো চোয়াড়ে চেহারার একটা লোক। তার মুখে বিড়ি। বিশ্বনাথবাবু এইটুকু পরিষ্কার দেখলেন। তারপর তাঁর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। তিনি আর বসতেও পারলেন না, চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। এমন অবস্থা তাঁর আরও দু-একবার হয়েচে। সেজন্যে দূর পথে একা যাতায়াতে সাহস করেন না। কিন্তু আজ বেরিয়েচেন একলা। তার কারণও ছিলো। সে ঘটনার সঙ্গে এ গল্পে কোন সম্পর্ক নেই।

তারপর তিনি সে অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন বলতে পারেন না। কিন্তু চোখ মেলেই দেখেন তাঁর গায়ের ওপর কি একটা পড়লো,

পাশে সেই ছোঁড়া ও লোকটা পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে। বিশ্বনাথবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা বোঝবার আগেই গাড়ি স্টেশনে পৌঁছে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। আর সেই লোকটা তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে নেমে অন্ধকারে ডুবে গেল। বিশ্বনাথবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর কোলের উপর তাঁরই গেঁজেটা পড়ে আছে। তিনি কম্পিত হাতে সেটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দেখেন, তার মুখটি তেমনি বাঁধা, কেবল বাঁধনের সুতো কাটা।

তিনি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছেলেটার হাত ধরে বলে উঠলেন।

"তোর কাজ! চোর! চোর।"

গাড়ি ততক্ষণে স্টেশনে থেমেচে। তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ স্টেশনে প্রতিধ্বনিত হলো। ছুটে এল শান্তি-রক্ষকেরা, এলেন রেল-কর্মচারীরা ও অতি কৌতূহলী যাত্রীরা। তাঁর কামরার সামনে অত রাত্রেও জমে গেল ভীড়।

বিশ্বনাথবাবু, "চোর! চোর!" বলতে বলতে ছেলেটাকে টেনে নামালেন। এবং ঘটনাটি সকলকে বলতে ছেলেটা বললে, "আমি গাঁট কাটিনি। যে কেটেছিল সে পালিয়েচে। তার হাত থেকে ভদ্রলোকের গেঁজেটা নিয়ে ওঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েচি। গাড়ি স্টেশনে না পৌঁছলে সে তো আমায় খুনই করে ফেলতো।"

বিশ্বনাথবাবু বললেন "তুমি যে কাটোনি, তার প্রমাণ কী? মশায়রা শুনুন, ও ছোঁড়াটা সেই ক্যানিং থেকে আমার পিছু নিয়েচে। আমিও হুঁশিয়ার ছিলাম। আমার পকেট থেকে টিকিট-খানা পড়ে গিয়েছিল। সেখানাও কুড়িয়ে নিয়ে বলে ওর টিকিট। সোনারপুরের আগে আর একটা লোক আমার কামরায় উঠেছিল। সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে মাথাটা ঠিক রাখতে পারিনি। তখন মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। শুয়ে পড়লাম। আর সেই ফাঁকে আমার গাঁট কেটেছে। সে লোকটা থাকলে সব পরিষ্কার হয়ে

যেত। সে হয়তো টিকট কাটেনি, চেকারের ভয়ে নেমে পালিয়েচে, কেন তার ওপর সন্দেহ করতে যাবো বলুন? এ ওর কাজ।'

"আমি কী দিয়ে আপনার গাঁট কাটলাম, দেখুন আমার পকেট। আর যে টিকিটটা আমি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম তা আপনার নয়, সেটা আমার।"

"ফের মিছে কথা বলচিস?"

জনতার মাঝ থেকে নানা রকমের মন্তব্য হতে লাগলো। একজন বললে, "মার শালাকে।" একজন বললে "পকেটমারে দেশ ছেয়ে গেচে।" আর একজন বললে, "বড় বড় চোর-ডাকাতেরা গদিয়ান হয়ে বসে আছে। মার খায় চুনো পুঁটিরা।" আর একজন কিছু চাপা সুরে বল্‌লে, "বুড়োটাই কতজনকে মেরে টাকার কুমীর হয়ে বসেচে কে জানে।" প্রত্যুত্তরে চার পাঁচটি কণ্ঠের হাসি শোনা গেল।

চেকার ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলে "যাবে কোথায়?"

ছেলেটা বললে, "যাদবপুর।"

বিশ্বনাথবাবু প্রতিবাদ করে উঠলেন, "ও আমাকে বলেচে বেলেঘাটা।"

চেকার জিজ্ঞেস করলে, "টিকিট আছে?"

ছেলেটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। উত্তর দিলে না। বিশ্বনাথ-বাবু বললেন, "দেখাও না হে। আপনারাই দেখুন আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ক্যানিং থেকে বেলেঘাটা ওর পকেটে আছে। আর ও যাবে যাদবপুর।"

চেকার আবার বললে, "টিকিট দেখাও।"

কিন্তু তার টিকিট দেখাবার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, "ওর পকেট সার্চ করুন স্যার। ও আমার টিকিট চুরি করেচে।"

চেকার বললে, "এ জমাদার! ওর পকেটটা একবার দেখতে হয়। প্যাসেনজার কমপ্লেন করচে।"

কিন্তু কাউকেই তা করতে হলো না। ছেলেটাই তার প্যাণ্টের পকেট থেকে একখানা টিকিট বার করে জনতার মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একজন তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'এ যে থার্ড ক্লাসের টিকিট। যাদবপুর থেকে ক্যানিং।"

"কৈ দেখি দেখি ?" জনতার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

চেকার বললে, "জমাদার। করচো কী ? ডিউটি করতে পারচো না যে।"

জমাদার মৃদু সক্রিয়তা দেখাতেই জনতা শান্ত হলো। টিকিটখানি চেকারবাবুর হাতে চলে এল। তিনি বিশ্বনাথবাবুকে বললেন, "মশাই ! এ তো এক্সপায়ারড্ টিকিট। তাও থার্ডক্লাসের। আপনার টিকিট কৈ ?"

বিশ্বনাথবাবু ঘেমে উঠলেন। বললেন, "তাহলে আমার টিকিট গেল কোথায় ?"

ছেলেটা বললে, "নিজেই টিকিট করেন নি। এখন অন্যকে চোর ধরচেন।"

জনতার চিন্তার স্রোত হঠাৎ উল্টোপথে বইতে শুরু করলো। একজন তো বলেই বসলো, "বুড়োটাই হয়তো ক্যানিংয়ের হাটে কোন ব্যাপারীর গাঁট কেটে গেঁজেটা বাগিয়েচে। হরেক রকমের গাঁটকাটা আছে।"

অমনি হো হো করে উঠলো হাসির রোল। জনতার নানা অপ্রিয় ও অশ্রাব্য মন্তব্যে বিশ্বনাথবাবু আর দাঁড়াতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি টিকিটের আবশ্যক মাশুল দিয়ে কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যে জনতাকে মনে প্রাণে তিনি চাইছিলেন, সেই জনতার কাছ থেকে এখন পালাতে পারলে বাঁচেন।

ছেলেটিকে পুলিশ বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ করবার অপরাধে গ্রেফতার করে অন্য প্ল্যাটফরমে নিয়ে গেল। বিশ্বনাথবাবুর সৌভাগ্য যে গাড়িও তখনই ছেড়ে দিলে। তিনি বসে বসে ব্যাপারটা আদ্যন্ত ভাবতে লাগলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এত বড় একটা ঘটনা

কেমন করে, কোথা দিয়ে যে ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারলেন না। অপমান ও পরাজয়ে তাঁর মন ভার হয়ে উঠলো।

সে রাতে বাড়ি ফিরে এসে আরামশয্যায় শুয়েও তাঁর ঘুম এল না এবং তিনি কাউকেই ঘটনাটির কথা জানালেন না।

পরদিন সকালে তিনি চা খাচ্চেন। তাঁর ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বললো, "বাবা, এই টিকিটখানা নেবো?"

"কিসের টিকিট? কোথায় ছিল? দেখি?"

"তোমার ঐ ডায়েরির মধ্যে।" মেয়েটির বাবার পকেট হাতড়ানোর অভ্যাস।

বিশ্বনাথবাবু তাড়াতাড়ি টিকিটখানি তার হাত থেকে নিয়ে দেখেন, তাঁরই সেই হারানো টিকিট। তিনি জড়ের মত বসে রইলেন। রাতের দৃশ্যগুলো তাঁর মনের চোখের সমুখ দিয়ে একে একে চলে যেতে লাগলো।

তার মধ্যে স্থির হয়ে রইলো কেবল ছেলেটির কোমল মুখখানি। খানিক পরে টিকিটখানি মেয়েটির হাতে দিয়ে তিনি নীরবে উঠে গেলেন। চা ও জলখাবারে আর রুচি রইলো না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই টাকার তাগিদে আবার চললেন বারাসতে।



দুটি বুলবুলের কাহিনী

পথের ধারে পোড়ো বাগান। মাঝখানে তার পোড়ো বাড়ি। কত কালের কে জানে!

দিনে-রাতে ছোট বড় কত পাখি আসে-যায়। এক এক জাতের পাখীর এক এক রকমের ডাক। শুনে পুষতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ধরা যায় না যে! তবু সাতনলী আর ঘাঁচা হাতে আসে ব্যাধ, ছানা পাড়তে। গাছে চড়ে দু-চারটে দুরন্ত ছেলে।

কখন হয়তো ধরা পড়ে পাপিয়া, কখন টিয়া, কখন বা টুনটুনি। তখন উঁচু ডালে কোথায় বসে আপন মনে শিষ দেয় দোয়েল, বোধহয় সাথীকে ডাকে। কী মধুর করুণ সুর! দিনের অন্তে শেষ আলোয় গান গায় বুলবুল। সে সুরের তুলনা নেই কোথাও। না শোনা যায় বীণায়, না শোনা যায় বাঁশিতে, কেবল বুলবুলের

কণ্ঠেই তা বাজে। সে গান শুনতে শুনতে চলে যায় দিন অস্ত সাগরে, শুনতে শুনতে আসে সন্ধ্যা কপালে তারার টিপ পরে। অন্ধকারে সে গান আর শোনা যায় না।

সেবারেও বসন্ত এসেছে। ঝোপেঝাপে, ডালে খোঁদলে পাখীরা বাসা তৈরি করেছে। বাসায় বাসায় ডিম, সাদা, সবুজ, গায়ে আবার কারো কালো ছিট, কারো বা লালচে। গানে গানে বাগান ছাপিয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নারাতেও কোকিল-পাপিয়ার আর ঘুম নেই, বুলবুল স্বপ্নঘোরে হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে।

বুড়ো নিমগাছটার মাঝ বরাবর গুঁড়ি আর মোটা শাখার গাঁটে একজোড়া বুলবুল বাসা বেঁধেছে। মা সারা দিনরাত ডিম দুটিকে বুকে রাখে, তাপ দেয়, ভালবাসা দেয়, ভাবে কবে ফুটবে। বাপ যায় খাবারের খোঁজে। গাছের ডালপাতা আর মাটি থেকে ধরে পোকামাকড়। সে নিজে খায় আর গান গায়। মনে পড়ে বুলবুলির কথা। সে না খেয়ে আছে। অমনি উড়ে যায় বাসায়। বলে, 'বুলবুলি, খেয়ে এস।'

বুলবুলি বলে, 'নজর রেখো। এলুম বলে।' বাছাদের ছেড়ে যেতে তার মন চায় না। উড়ে যায় পাঁচিলের ধারে, কাঁটা-ঝোপের তলায়। ঐখানে পাতিলেবুর ডালে টুনটুনির বাসা। টুনটুনি আঁতকে ওঠে। সভয়ে বলে 'কে?'

বুলবুলি সাড়া দেয় গানের সুরে।

টুনটুনি শুনে খুসি হয়ে তাকে শিষ শোনায়।

দুটো দুরন্ত ছেলে তাকে তাকে থাকে; তারা বুলবুল-জোড়াকে দেখে আর বলাবলি করে, 'কী সুন্দর দেখতে! একজোড়া সাহেব বুলবুল। ঐ দ্যাখ কী রকম ঝুঁটি ফোলাচ্ছে, ঘাড় উঁচু করছে, বুক চিতিয়ে এদিক তাকাচ্ছে। লেজ আর পালকের কী বাহার! ধরতেই হবে।'

একজন বলে, 'ধাড়ি দুটোকে ধরা যাবে না।'

'না যাক্, ওদের ছানা দুটোকে পাড়বো।'

বাপ বাসা পাহারা দিতে দিতে ছেলে ছুটোকে দেখেই বলে ওঠে, 'শত্রু, শত্রু, শত্রু!'

মা শুনতে পায়। খাওয়া ফেলে উড়ে আসে। বাসায় ঢুকে ডিম ছুটো বুক দিয়ে আগলে রাখে, বলে, 'কে নেয় দেখি! চোখ ঠুকরে কানা করবো, ধারালো নখে মাংস ছিঁড়ে ফেলবো।'

ছেলে ছুটো তাদের দেখে, আনন্দে হাসে। বলে, 'কী স্থন্দর! ধরতেই হবে।'

তারা ফন্দি আঁটতে আঁটতে চলে যায়।

ছুপুরে সাতনলী হাতে আসে ব্যাধ। বুলবুল নিঝুম ছুপুরে বাসার ধারে বসে গান গাইছে। দক্ষিণে হাওয়ায় সে গান উড়ে চলেছে বাগান পার হয়ে।

ব্যাধ খুব আস্তে আস্তে একটি ছুটি করে নল পরায়। নলের আগা বুলবুলকে ছোঁয় ছোঁয়। অমনি সে হুঁশিয়ার হয়, উড়ে গিয়ে বসে পাশের গাছে। বলে, 'কী আপদ।'

বুলবুলি বাসায় মাথা লুকোয়, তলা থেকে দেখা যায় না।

ব্যাধ নিরাশ হয়ে এগিয়ে চলে। একটি বিড়াল গুটি গুটি এসে গাছটার গোড়ায় বসে। জ্বলন্ত চোখে ওপর দিকে তাকায়, কিছুই দেখতে পায়না, কেবল গন্ধ লাগে নাকে। কী মধুর! সে হাই তুলে চোখ বুজে বসে থাকে।

একটা গোখরো সাপ, হ্যাঁ গোখরো, ঘাসের বন দিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। ব্যাঙ তো বছরের এ সময়ে খোঁদলে ফাটলে গর্তে কুম্ভক করে বসে আছে। সেই আষাঢ়ে কবে আকাশে নূতন মেঘের ঘটা হবে তখন ওরা গান্ধারে ধরবে মল্লার। আর তখনই ওদের গিলতে পারা যাবে। এখন ভরসা ইঁছুর পাখি আর পাখির ডিম। সাপের চলা-ফেরা গোপনে। তাই সে গা ঢাকা দিয়ে চলে খাবারের খোঁজে।

দিন যায়। গাছে গাছে নূতন পাতা, আম-মউলের গন্ধে বাতাস ভারি, বেড়ার ধারে ফুটেছে মেহেদী ফুল, আকাশ যেন রাঙা হয়ে

উঠেছে। সেদিন বুলবুল-জোড়ার ডিম দুটি ফুটে ছানা বেরিয়েছে। ছোট ছোট দুটি মাংসের ডেলা, গায়ে পালক গজায়নি, চোখ ফোটেনি, কিন্তু খাবার জন্যে খালি কাঁদে—চিঁ চিঁ চিঁ। বাপ-মা সারাদিন ভারি ব্যস্ত। মায়ের দরদ বেশি। সারাদিন বিশ্রাম নেই। আরও কত পাখির ছানা হয়েছে। খাবার যে পাওয়াই যায় না। পোকামাকড়গুলো যেন মরেছে। ক্ষেতেও ধান নেই, গাছেও ফল পাকেনি, হাটবাজারও অনেক দূর। কী যে মুশকিল! বাছারা তো বোঝে না। খালি বলে, 'মা খিদে।' ওদের কী দোষ? ছেলেপুলে পালন করার দায় যে কী ওরা কী বুঝবে? বেঁচে থাক বাছারা!

বাপ-মা এদিক-ওদিক থেকে যা পায় ঠোঁটে করে আনে, ছানা দুটিকে খাওয়ায় আর ফাঁকে ফাঁকে গান গায়। গান গায় কোন এক ভরাবনের, কোন আনন্দ দিনের, কোন মুক্তির। ছানা দুটি দিনে দিনে বড় হয়। তারা সে গান শোনে, নিজেরাও গাইবার চেষ্টা করে, পারে না। কিন্তু তাদের বড় ভাল লাগে। কী সুন্দর! বলে, 'মা, গান।' মা গায়, বাবা গায়! সে সুর ঝরে পড়ে মাটিতে, উড়ে যায় বাতাসে।

ছেলে দুটি তাকে তাকে আছে। তারা বুঝেছে, ডিম ফুটে ছানা বেরিয়েছে। এইবার ওদের পেড়ে আনতে হবে। কিন্তু পাখি দুটো একসঙ্গে বাসা ছাড়া হয়না যে! বুলবুল গান গাইলে কী হয়? ভারী রাগী পাখী। লড়াই করে মরদের মতো। ওদের চোখা ঠোঁট, ধারাল নখ সাংঘাতিক। কিন্তু মানুষের সঙ্গে বুদ্ধিতে পারে কে? পৃথিবীতে বুদ্ধিমান আর কর্মঠেরই জয়।

একদিন দুপুরে ছেলে দুটির একটি গাছটিতে চড়ছে। বুলবুলি তখন পাহারা দিচ্ছে আর দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে গান গাইছে। বুলবুল বাগানের বাইরে গেছে খাবারের খোঁজে। গাছটি দুলে উঠতেই বুলবুলির গান থেমে যায়। সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে মানুষ। অমনি বলে ওঠে, 'শত্রু শত্রু শত্রু।' তাও শোনা যায় গানের মতো।

তাই শুনে কয়েকটা শালিখ চীৎকার করে ওঠে, 'কে রে কে রে! কে রে কে রে!'

বুলবুল কোথা থেকে তা শুনেই উড়ে আসে। ছুটিতে একবার এ-ডাল, আরবার ও-ডাল করে। তাদের মাথার ঝুঁটি উঠেছে ফুলে, চোখ ছলছল করছে আর মাঝে মাঝে গভীর স্বরে বলে, 'যাও।'

ছেলেটি হাসতে হাসতে নেমে যায়; সঙ্গীকে বলে, 'হলো না রে! আর একটু উঠলেই ঠোক্কর দেবে।

সঙ্গী বলে, 'তুই থাক্, আমি পেড়ে আনছি।'

'কী করে?'

'এই ছাখ।'

সে দেখে তার হাতে একটা হাঁড়ি। হাঁড়িটা পড়েছিল তফাতে। কে জানে কিসের। ওদের মনে ঘৃণা নেই, ভালমন্দ বোধ নেই। ওরা নিষ্ঠুর! ওরা চোর!

তবু সঙ্গী বলে, 'আজ থাক। আর একটু বড় হোক।'

তার কথাই থাকে। দিনে দিনে ছানা ছুটি আর একটু বড় হয়। এখন মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য বাবা-মা ওদের বাসায় রেখে এদিক-ওদিক উড়ে যায় খাবারের খোঁজে।

ছেলে ছুটো তাকে তাকে আছে। সেদিনও ছুপুরে বাপ-মা বাসা ছেড়ে একটু তফাতে যায়। যাবার সময়ে মা বলে, 'সাবধানে থাকিস। বাসার কিনারায় উঠিস না। যে বাতাস। পড়ে যাবি। পড়লে আর তোদের পাবো না বাছা!'

শেষের কথাগুলো ভারি করুণ!

ছানা ছুটি মায়ের মুখের দিকে তাকায়, ডানা কাঁপায়, বলে, 'আমাদের নিয়ে যাও। যখন থাক না তখন কেমন ভয় করে।'

মা বলে, 'সঙ্গে যাবার দিনের আর দেরি নেই! ভয় কিসের? শত্রু কাছে নেই।'

বাপ-মা উড়ে যায়, আর হাঁড়ি মাথায় উঠে আসে সেদিনকার ছেলেটা।

এসেই ছানা দুটিকে ধরে। তারা কাঁদে, 'মাগো—ওমা! মাগো—'

ছেলেটা তাদের কোঁচড়ে পুরে নামতে থাকে ; কী জানি মনে হয় বাপ-মায়ের মনে। তারা উড়ে আসে ব্যস্ত হয়ে! এসে দেখে বাসা খালি, শত্রু নেমে যাচ্ছে। চীৎকার করে, 'চোর—চোর—চোর।'

তার মাথা ঠোকরাতে আসে, ডানার ঝাপট মারে, ছোঁ দেয়, ছুরির মতো ধারালো নখ দিয়ে আঘাত করে। কিছুই হয় না।

নিচের ছেলেটা হাততালি দেয়, ঢিল ছোঁড়ে, লগা দিয়ে ডালে আঘাত করে। আরও চার-পাঁচটা ছেলে এসে জোটে। সকলে চীৎকার করে। ছানা দুটির বাপ-মা নিস্ফল রাগে ঝুঁটি ফুলিয়ে এ-ডালে ও-ডালে বসে, নেমে আসে, ছোঁ দেয়। কিন্তু মানুষের বাচ্চার সঙ্গে ওরা পারবে কেন? তারা ছানা দুটিকে নিয়ে চলে যায়।

বাপ-মা শূন্য বাসার দিকে তাকিয়ে কাঁদে, বলে, 'হায়! হায়! আয় ফিরে আয়।'

সে করুণ গান শুনতে শুনতে রাঙা হয়ে দিন চলে যায়, আসে মলিন মুখ সন্ধ্যা, কপালে তারার টিপ, গলায় জোনাকির মালা। শুনে নীরবে তাদের বুকে নেয়, বাতাস দোলা দেয়, ঝিঁঝিঁ গায় ঘুমপাড়ানি গান।

পরদিন সন্তানহারা পাখি দুটি বাসা ফেলে উড়ে যায় দক্ষিণের আমবাগানের দিকে।

শূন্য বাসা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

ছেলে দুটো ছানা দুটিকে এনে খাঁচায় রাখে, পোকামাকড় খাওয়ায়, খাওয়ায় ছাতুর ছোট, ছোট গুলি ওদের মা যেমন করে গলায় পুরে দিত তেমনি করে। ওরা খায়। মনে করে মা বুঝি খাওয়াচ্ছে। পাখির মন, মাকে ভুলতে দেরি হয় না। যে খাওয়ায় তাকে চেনে। যখন খিদে পায় কাঁদে। এমনি করে দিনে দিনে

বড় হয়। সারা গায়ে পালক গজায়, সবুজ, সাদা, কালচে। মাথায় ওঠে ঝুঁটি, লেজ হয় লম্বা। এখন মাঝে মাঝে শিষ দেয়, এক একদিন আপন খেয়ালে গান গায়—সে কোন দূর বনের, আনন্দ দিনের, মুক্তির।

ছেলেদের একজন বলে, 'আমারটা বেচবো যারা বুলবুলের লড়াই করায় তাদের।'

অন্যজন বলে, 'আমারটা পুষবো।'

সঙ্গী বলে, 'কী বোকা! ছানা কী আর পাওয়া যাবে না? আবার তো বসন্ত এলো। আবার ধরবো। চল বেচে আসি।'

যে পুষতে চেয়েছে তার ছাড়তে মন চায় না। বলে, 'না, এটাও রাখবো, সেটাও রাখবো। চল্, তোর পাখিটা বেচে আসি!'

দুজনে যায় বাজারের দিকে। বেশ চড়া দামে পাখিটা বেচে কিছু তেলেভাজা কিনে সানন্দে খেতে খেতে দুজনে আবার বুলবুল ধরা ফন্দী আঁটতে আঁটতে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় জন বাড়ি এসে দেখে পাখি নেই, খালি খাঁচা। পাখিটা ঘরের চালে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর ডাকছে। আর, তার মা ও ছোট ভাই উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকছে—'আয়—আয়—আয়।'

কিন্তু সে আসবে কেন? সে যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। তার চারধার খোলা। মাথার ওপরে আলো-মাখা খোলা আকাশ, দিগন্তে সবুজ বন, নিচে সবুজ মাঠ। কিন্তু ডানা দুখানি যে ওড়ায় অনভ্যস্ত। ছেলেটি আস্তে আস্তে চালে উঠতে থাকে। তাকে ধরবে পিছন দিক থেকে। পাখিটা একটু সরে বসে। তারপর সে হাত বাড়িয়ে ধরতে যেতেই পাখিটা উড়ে গিয়ে বসে বকুল গাছের মাথায়। বসেই একবার শিষ দেয়। তারপর উড়ে চলে যায় দূরে, আরও দূরে।

ছেলেটা নেমে আসে। জিজ্ঞেস করে মাকে, 'কি করে খাঁচার বাইরে এল?'

মা বলে, 'খোকা ওকে মিছরির দানা খাওয়াতে গিয়েছিল। খাঁচার দরজা খুলে হাত ঢোকাতেই ও হাতে মারে ঠোকর। হাত

সরিয়ে নিতেই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়েই উড়ে চালে গিয়ে বসে। তারপর···'

আর শুনতে পারে না, ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে তার চোখে আসে জল। হায় রে! কত যত্ন করে পুষছিল, উড়ে গেল! কী সুন্দর ছিল। কিন্তু কী বেইমান! 'আবার বুলবুল ধরবো' প্রতিজ্ঞা করে।···

দিন যায়, মাস যায়, বছরও যায় যায়। আবার বসন্ত এসেছে।

সেই বুলবুলি দুটি এবার বাসা বেঁধেছে পোড়ো বাড়িটার আলসের তলায় ঘুলঘুলিতে। ওধারে ভাঙা সিঁড়ি। বুলবুলি ডিম দুটিকে বুক দিয়ে চেপে রাখে, একটুও নড়ে বসতে চায় না। বুলবুল আলসের পাশে কী বকুল গাছের ডালে বসে পাহারা দেয়।

একদিন দুটিতে নিজের নিজের জায়গা থেকে দেখে, বাগানের বাইরে বস্তিটার ধারে অনেক মানুষ আর তাদের মধ্যে দুটো দাঁড়ে দুটো বুলবুল।

কী ব্যাপার? বুলবুল দুটো উড়ে পালায় না কেন? বুঝতে পারে না, ওদের পা দাঁড়ে রেশমী সুতো দিয়ে বাঁধা। ওদের লড়াই হবে, বাজি রেখে লড়াই। যে জিতবে তার মালিক পাবে অনেক টাকা! আর সে? তার দাম বাড়বে। বেচলেও অনেকগুলো টাকা। সে পাবে পোকামাকড় ফল, বন্ধন আরও বেশি হবে। যেন না পালায়!

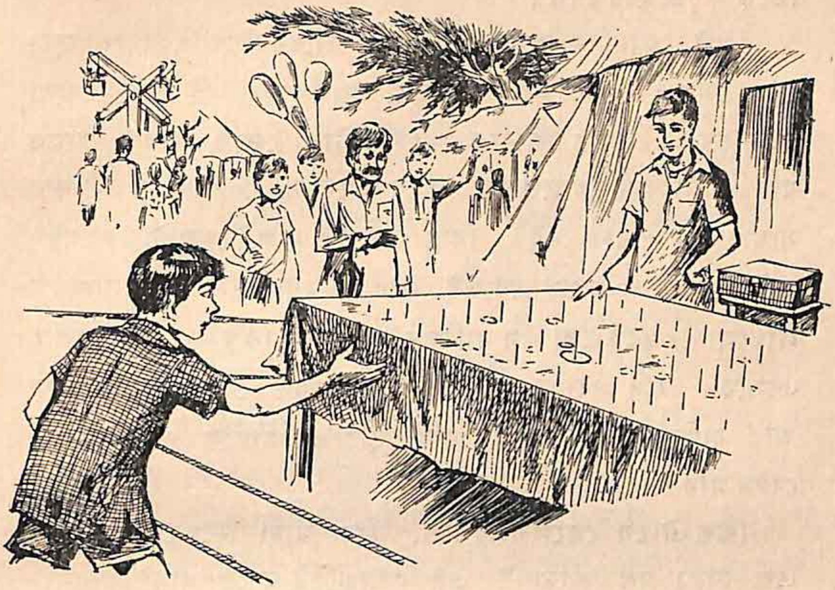
বুলবুল দুটো চিনতে পারে না, ঐ যে ঘাড় উঁচু করে দাঁড়ে বসে আছে সে তাদেরই ছানা। কী ভারিক্কী চাল!

পাখি দুটোকে সামনা-সামনি মাটিতে রেখে শুরু হয় লড়াই। তারা ডানার ঝাপটা মারে, ধারালো নখ ও চোখা ঠোঁট দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে। রক্তে পালক ভিজে যায়। দুটি বুলবুলই উত্তেজিত। ওরা যে মধুর গান গায় তা তখন বোঝা যায় না, মনে হয় দুই খুনী পাখি। ওদের মাথায় খুন। দর্শকদের উৎসাহে খুন আরও চড়ে। মালিকরা আনন্দে দুটোরই সুতো ছেড়ে দেয়।

আক্রমণের বেগ আরও বেশি হয়। হঠাৎ আমাদের চেনাটি অচেনাটির বুকে গভীরভাবে নখ বসিয়ে দেয়। হৃৎপিণ্ডে লাগে। পাখিটা তৎক্ষণাৎ মরে যায়। আর দর্শক ও মালিকের উল্লাসধ্বনিতে মাঠ ছাপিয়ে ওঠে।

কিন্তু বিজেতা টলতে থাকে। টলতে টলতে হঠাৎ কাত হয়ে পড়ে যায়। তারপর—তারপর আর ওঠে না, চোখও মেলে না। শত্রুও তাকে মরণাঘাত করে গেছে!

মালিক হাহাকার করে কেঁদে ওঠে, স্নেহে ও মায়ায় নয়, অনেক টাকা লোকসান হলো বলে। আর গাছের ডালে বসে তার বাবা ও ছাদের আলসের খোঁদলে বসে ডিম দুটি বুকে নিয়ে তার মা দিনান্তের শেষ আলোর গান গায়—করুণ, মধুর, সে কোন্ দূর সবুজ বনের?



বিল্লীর জুয়া খেলার ফল

বিল্লী মেলায় ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়লো যেখানে জুয়া খেলা হচ্ছে সেখানে। জায়গাটিতে বেশ ভিড়। এক ফোঁটা মধুর চারধারে যেমন পিঁপড়ে লেগে থাকে লোকগুলো জায়গাটাকে ঘিরে ধরেছে তেমনি করে। চারধারে বলা ঠিক হবে না, তিন ধারে, আর এক ধারে জুয়াড়ীদের তাঁবু। খেলাটা হচ্ছে তাঁবুর সামনে।

সে ভিড়ের ভেতর ঢুকবে কিনা ভাবছে এমন সময়ে ভিড় ঠেলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল তুটি ছেলে। তারা তার চেয়ে বড়ই হবে।

তাদের একজন বললে, "এক টাকা দশ আনা—চার আনা নিয়ে খেলতে নেমে এক টাকা দশ আনা।"

অপরজন বললে, "দেখি—দেখি—"

"আর দেখে না" বলে আগের ছেলেটি পয়সাগুলো ট্যাঁকে

গুঁজেই দিলে ছুট। তার সঙ্গীও পিছু নিল। এবং তারা তৎক্ষণাৎ ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিল্লী কোনদিন জুয়া খেলেনি। তাদের গাঁয়ে কোথাও জুয়া খেলা দেখেও নি। কিন্তু শুনেছিল, বল্লভপুরের এই মেলায় জুয়া খেলা হয়। খেলায় অনেকে অনেক টাকা জেতে, আবার হেরেও যায়। কি করে খেলতে হয় তা সে জানে না, খেলাটা যে কী তার সঙ্গেও তার পরিচয় নেই। কিন্তু সকলেই বলে, খেলাটা দোষের। তাই খেলাটার কাছে যেতেই তার প্রথমটা ভীষণ ভয় করতে লাগলো। একে তো সে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে মেলায় এসেছে। যদি ওখানে তাদের গাঁয়ের কেউ তাকে দেখে ফেলে আর বাড়িতে গিয়ে বলে দেয় তাহলে কপালে দুর্গতি অর্থাৎ বেদম মার।

কিন্তু ঐ যে ছেলেটি বললে, "চার আনা নিয়ে খেলতে নেমে এক টাকা দশ আনা।" এই কথাগুলিই তাকে আকৃষ্ট করলো। তার কাছে চার আনা নেই বটে কিন্তু সাতটি পয়সা আছে। চারটি পয়সা সে বাড়িতে অনেক চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করেছে, বাকি তিনটি পয়সা পেয়েছে তুলসীতলা খুঁড়ে। পয়সা তিনটি কে কবে কার জন্যে মানত করে পুঁতে রেখেছিল কেউ জানে না। কিন্তু বিল্লী গল্প শুনেছিল। একজন একখানি পোড়ো বাড়ির ভাঙা তুলসীমঞ্চ খুঁড়ে পেয়েছিল এক ঘড়া মোহর। তারপর মোহর পেয়েই সে বড়লোক হয়ে যায়। তাদেরও বাড়িখানি পুরানো তবে পড়ো নয়। দালানের চারখানি ঘরের মধ্যে দু'খানি প্রায় ভেঙে পড়েছে। বর্ষায় বাকি দুখানির ছাদের কোণ দিয়ে দেয়াল বেয়ে জল পড়ে। উঠোনে অনেককালের একটা বাঁধানো তুলসীমঞ্চ। একদিন দুপুরে যখন সবাই ঘুমোচ্ছিল, তখন মঞ্চটার সমুখের খানিকটা খুঁড়তে খুঁড়তে সে পয়সা তিনটি পায়। আরও হাতখানেক খুঁড়লে কি পেত কে জানে। কিন্তু বড় মামা এসে পড়াতে আর খোঁড়া হয় না। যতখানি খুঁড়েছিল তার জন্যেই তাকে ধমক

খেতে হয় খুব। বড় মামা রোগা মানুষ, মারতে পারেন না, বকেন। সেজ মামা হলে—যাক্ সেকথা।

আমার লিখতে যতখানি সময় লাগছে তার চেয়ে অনেক—অনেক কম সময়ে তার মনে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল এক সুখ ছবি। সে ভেবে নিলে, সাত পয়সায় সেও পেতে পারে এক টাকা দশ আনা। মেলায় ঢোকবার পথে সে দেখেছে একসার খাবারের দোকান। একটা দোকানে জিলিপি ভাজা হচ্ছে। তার নাকে এখনও লেগে আছে টাট্‌কা জিলিপির মিঠে গন্ধ। ময়রা রসে ভরা জিলিপিগুলো ঝাঁঝরি করে তুলে পরাতে রাখছে। আর, চার-পাঁচটা লোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কলা পাতায় করে জিলিপি খাচ্ছে। তাদের মধ্যে ছিল তার বয়সীও একটা ছেলে। সে জুয়ায় জেতা পয়সা দিয়ে দশখানা জিলিপি কিনে খাবে! কিনবে ছ'টা মার্বেল। লাটু তাকে সেদিন একটা ভাঙা মার্বেল নেবার জন্যে বড় অপমান করেছিল। তার শোধ নেবে। আর মায়ের জন্যে কিনে নিয়ে যাবে চার আনার—না না ছ' আনার মিছরি। মায়ের জ্বর—কাল থেকে মা কিছু খায়নি, খেতেও পারে না, অসুখ নিয়েই কাজ করছে। মা সেদিন বলছিল, 'বাবা থাকলে নাকি এত কষ্ট সইতে হতো না!' কিন্তু মামারা তো মায়ের ভাই। তবু মায়ের কষ্ট!

আর ভাবা হলো না। আবার একটা ষণ্ডামার্কা লোক হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। জনকতক লোক তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "ওঃ! খুব মেরেছে—দশ টাকা!"

যে পথে লোকটা বেরিয়ে এল সেই পথে বিল্লীও ঢুকে গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে টেবিলের সামনে দড়ির ঘেরার বাইরে। টেবিলখানা তার গলা সমান উঁচু। লাল শালু দিয়ে মোড়া, উপরে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও আনি বসানো আর প্রত্যেকটির পাশে একটি করে শিক পোঁতা। চার পয়সায় একটি বালা কিনে ওর উপর ছুঁড়ে দিলে বালাটা যে শিক গলিয়ে পড়বে তার পাশে যা থাকবে তা যে বালা ছুঁড়বে তার। বিল্লী দেখলো, কয়েকটা ছেলে

বালা কিনে শিক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলে। কিন্তু বালা গিয়ে পড়লো শিকের পাশে। বিল্লীর পাশ থেকে পর পর ফেললো দুজন বয়স্ক লোক। তাদের একজনের বালা পড়লো পাশে আর একজনের পড়লো শিক গলিয়ে। ওমনি রব উঠলো, "টাকা মেরেছে—টাকা।"

মার্বেলে বিল্লীর হাতের বেশ টিপ। সে আর থাকতে পারলো না, চারটি পয়সা বালা বিক্রেতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, "আমায় একটা বালা।"

লোকটা পয়সা চারটে হাতে নিয়েই "ধ্যেৎ" বলে ফিরিয়ে দিলে। তারপর আবার বললে "চলবে না।"

পয়সা যে অচল হয় তা বিল্লী কোনদিন শোনেনি। সবচেয়ে ভাল নাকি মহারানী মার্কা পয়সা। এগুলো তো মহারানী মার্কাই দেখা যাচ্ছে। তবে মহারানীর চেহারা কিছু অস্পষ্ট ও গায়ের রঙ কালো হয়ে গেছে। বোধহয় অনেককাল কবরে ছিল বলে কালো হয়েছে। সে মহারানী মার্কা পয়সা তিনটে বাঁ হাতে রেখে নতুন ছেঁদা পয়সা চারটি দিয়ে একগাছি বালা কিনে আধুলি টিপ করে দিলে ছুঁড়ে। বালাগাছিটা ছপ করে পড়লো একটি দুয়ানিতে। দর্শকদের মধ্যে উঠলো গুঞ্জন আর বিল্লীর মনে দেখা দিলে দুঃখ ও আনন্দ। সে আধুলিটা পেল না, পেল দুয়ানি। আধুলিটা সে নেবেই।

সে আবার বালা কিনলো। আবার ফেললো। এবারও পেল না। এমনি করে খেলতে খেলতে হলো দশ আনা। তার মনে তেমনি দুঃখ ও আনন্দ। তবু আধুলিটা তার ভাগ্যে জুটলো না! তার উপর তখনও এক টাকা বাকি।

পাশ থেকে একজন বললে, "খোকা। এই বেলা সরে পড়। সব যাবে।"

কিন্তু যে কাজে সফলতা লাভ হচ্ছে সে কাজ কী মাঝখানে কেউ ছাড়তে পারে?

বিল্লীও ছাড়তে পারলো না। সে আরও এক টাকা জিতবেই। সেই ছেলেটা, সেই লোকটা, সেই আকাঙ্ক্ষা তার মনে ভেসে

উঠলো। তাই রোখ চড়ে গেল। সে আবার বালা কিনলো। আবার খেললো। কিন্তু ক্রমে সে হারতে ও হারাতে লাগলো। শেষে সব গেল। তার হাতে রইলো কেবল রানী মার্কা সেই কালো পয়সা তিনটি।

বিল্লী আর দাঁড়ালো না। কোন রকমে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। তখনই দুটো লোকও তাকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দুজনের একজনকে দেখতে তার সেজ মামার মতো—না না হতে পারে না। তবুও তার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। ভয়ে দুঃখে তার আর মেলায় থাকতে মন চাইলো না। লোকটা নিশ্চয়ই সেজ মামা নয়। ভেতরে গিয়ে একবার দেখতে পারলে—কিন্তু সাহস হলো না। সে চললো মেলার বাইরে। চললো ভানুমতীর খেলাঘর বাঁয়ে রেখে, নাগরদোলা ডাইনে ছেড়ে, পক্ষীরাজের চরকির পাশ দিয়ে, তেলেভাজার খাবারের দোকানগুলো ঘুরে। বাজছে ডুগডুগি, বাজছে বাঁশী, ঐ ধারে খোল-করতাল বাজিয়ে হচ্ছে গান। লোকের ঠেলাঠেলি, কল-কোলাহল। এ যে বল্লভপুরের মেলা। কত গাঁ থেকে এসেছে কত লোক।

বিল্লী চলতে চলতে গিয়ে পড়লো সেই খাবারের দোকান সারির সামনে। তখনও জিলিপি ভাজা হচ্ছে। বিল্লী এসেছে সেই সকালে। এখন সূর্য উঠে আসছে মাথার উপর। ছায়া হচ্ছে ছোট। বিল্লীর মনও যেন ধুঁকতে শুরু করলো। সে একটা দোকানের সামনে গিয়ে চাইলে একখানি জিলিপি। দোকানী পাতায় করে রসালো একখানি জিলিপি দিলেও কিন্তু পয়সা দুটি হাতে নিয়েই বিল্লীকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে, "ভিক্ষের পয়সা আমি নিইনে। ঐ গাছতলায় দাঁড়িয়ে খাওগে।"

বিল্লী অবাক হয়ে বললে "ভিক্ষের পয়সা? আমি ভিখিরী নই। পয়সা বাড়ি থেকে এনেছি।"

"যাও—যাও—বেচাকেনার সময়ে গোল করো না।"

হারের দুঃখ, মারের ভয়, সেই সঙ্গে যোগ হলো অপমান! কী

জানি কেন, সে নিজের পোশাকের দিকে তাকালো। তার পরনে ময়লা হাফপ্যাণ্টটার ছেঁড়া-সুতো বেরিয়ে আছে, গায়ে ছিটের ময়লা হাফশার্ট, বুকের দুটো বোতাম নেই, গলার একটা পাশের কলার ছেঁড়া। সে যাদের ভিখিরী বলে তাদের এ পোশাকও থাকে না। তবে লোকটা তাকে ভিখিরী বললে কেন? কেন তাকে অপমান করলো? তার রাগ হলো। সে হাতের জিলিপিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ালো এক কাঙালিনী। বিল্লী তাকে বললে, "নেবে?"

স্ত্রীলোকটি হাত বাড়ালো। বিল্লীও তাকে জিলিপিখানি দিয়ে মেলার বাইরে আসতেই একটি খোঁড়া ভিখারীকে দেখতে পেল। কিন্তু লোকটি তার কাছে ভিক্ষা চাইলে না, তার পাশের লোকটির দিকে হাত বাড়াতেই বিল্লী তার হাতে পয়সা তিনটি দিয়ে বললে, "নাও।"

লোকটি পয়সা তিনটির দিকে তাকিয়ে দেখে হাত মুঠো করে কপালে ঠেকালো যেন বিল্লীকে নমস্কার করলো আর বললো, "আল্লা তোমার ভাল করবে।"

বিল্লীর মনে এতক্ষণে এল তৃপ্তি। তার মনে হলো, সে একটা বড় কাজ করেছে এবং সে ছোট নয়। কিন্তু যে পয়সা জুয়াড়ী ও খাবারওয়ালা নিতে চাইলো না সে পয়সা ভিখিরী নিল কেন? তবে কি ওদের কাছে যা চলে না এদের কাছে তা চলে? পর মুহূর্তে আবার তার মন সেই আগের মতোই মুষড়ে পড়লো। সে বাড়ি ফিরে চললো এবং যখন বাড়ি পৌঁছলো তখন বেলা দুপুর।

সে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকলো এবং আশ্চর্য হয়ে গেল যে, কেউ তাকে জিগ্যেস করলে না কোথায় গিয়েছিল?

কেবল বড়মামা বললেন, "খেয়ে আমার কাছে এস।"

প্রচণ্ড খিদে পেলেও বিল্লীর গলা দিয়ে ভাত যেন আর নামে না। সে কেবল খায় জল। অবশেষে তাকে বড়মামার কাছে হাজির হতেই হলো।

বড়মামা রোগা মানুষ কিন্তু আজ হাতে বেত।

তিনি জেরা শুরু করলেন, সেও প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু খাবারওয়ালার অপমান ও খোঁড়া ভিখারীকে তিনটে পয়সা দানের কথা বলবার সুযোগ পেল না।

মামা বললেন, "তুমি জুয়ায় দশ আনা জিতেছিলে। তোমার পাওনা চল্লিশ ঘা বেত। সইতে পারবে?"

বিল্লী তখন মরিয়া, বললে "হুঁ"।

বড়মামা রোগা মানুষ। মারেন না বকেন। কিন্তু সেদিন তাকে গুণে গুণে চল্লিশ ঘা বেত লাগালেন।

বিল্লীর মা ভাঙা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন, "ওকে খুব মারো। মারো—আরও মারো।"

কিন্তু চল্লিশ ঘা মারবার পর বড়মামা আর একটি ঘাও মারলেন না, বললেন. "বেতখানা আমার ঘরের কোণে রেখে এস।"

বিল্লীর দুটি গাল বেয়ে জল ঝরছে, গা জ্বালা করছে। সে বেতখানি হাতে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে এল।

তারপর সেজমামা ফিরে এলেন, সব শুনলেন, কিন্তু একটি কথাও বললেন না। তিনিও গিয়েছিলেন মেলায় আর সেই জুয়ার আড্ডায়। বিল্লী তবে ঠিকই দেখেছিল। তাঁকে তো বড়মামা কিছুই বললেন না। যা দোষের তা তো সকলের পক্ষেই দোষের?

বিল্লী রাতে মায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে খাবারওলা ও খোঁড়ার বিষয়টি বলে জিগ্যেস করলো, "মা আমাকে সত্যিই ভিখিরীর মতো দেখতে?"

মা বললেন "লোকে তো সব সময়ে ঠিক কথা বলে না বাবা।"

"আচ্ছা মা, আমায় যখন মারছিল তখন কি তোমার কষ্ট হচ্ছিল না? তবে কেন বলছিলে, আরও মারো?"

মা তাকে দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ঘটনাটি এখানে শেষ হলেই ভাল হতো কিন্তু সব তো আমাদের হাতে নেই। তাই পরদিন বিল্লীর জনকয়েক বন্ধু তাকে দেখেই বলতে লাগলো, "জুয়াড়ী—। ঐ জুয়াড়ী চলেছে।"

বিল্লীর জুয়া খেলার কথা কি করে তারা জানতে পারলো, কে তাদের ঐ কথাগুলো বলতে শেখালো তারাই জানে। তারা তাকে অস্থির করে তুললো। মামার মার লেগেছিল গায়ে, তাদের বিদ্রূপ গিয়ে বিঁধলো তার বুকে। সে এবার গভীর দুঃখে কাঁদতে লাগলো। বিদ্রূপের চেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি আর কি আছে?

ঘটনাটি জানতে পেরে আমার মনে বার বার এই প্রশ্ন উঠছে— বয়স্কের চেয়ে বালকের দোষ কি বেশী হয়েছিল?



ক্ষতিপূরণ

পঞ্চু ছাদে বসে রোদে পিঠ দিয়ে বই পড়ছিল। ডিটেকটিভ গল্পের বই। নিচে বসে পড়লে দাদা দেখতে পাবে। ডিটেকটিভ বই ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওর সবই যেন কেমন ধারা! ওঃ! গল্পটা কি জমেছে। ডাকাতগুলোকে ধরবার জন্যে গোয়েন্দা সম্রাট অরুণ কুমার একা পোড়ো বাড়িটার দেয়াল টপকে বাড়িটার মধ্যে নেমে পড়েছে। এমন সময়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখে পিস্তলটা নেই। তার বদলে হাতে ঠেকলো এক টুক্‌রো কাগজ। এ চিঠি না হয়ে যায় না।

এমন সময়ে পিসী ছাদে এল—হাতে পাথরের থালা। তাতে ছড়া তেঁতুল। পিসী থালাখানা রোদে রেখে বললে, "পঞ্চু, নজর রাখিস্। কাকে মুখ না দেয়।"

এ বাড়ির মধ্যে পিসী যা একটু বিশ্বাস করে পঞ্চুকে।

পঞ্চু বললে, "হুঁ।"

পিসী নেমে গেল।

পঞ্চু পড়লো মুশকিলে। একদিকে ডিটেকটিভ গল্প, আর একদিকে পিসীর ছড়া তেঁতুল। গল্পটা শেষ করতে মন করছে ছটফট, আর ছড়া তেঁতুলের জন্যে আসছে জিভে জল। সে গল্প পড়বে, না তেঁতুলের দিকে চোখ রাখবে?

কিন্তু তার মনে হলো, তেঁতুলগুলো থালায় যেমনভাবে থাকা উচিত তেমনভাবে যেন নেই। সে গল্পের বইখানা উল্টে রেখে থালার কাছে উঠে গিয়ে কয়েকটা ছড়ার বোঁটা ধরে থালায় সমান করে রাখলো। তারপরই আবার মনে হলো, কয়েকখানি ছড়ার গায়ে তেল-গুড়-মশলা যেন ঠিকমতো মাখানো হয়নি। তাই সে ছড়াগুলির গায়ে আঙ্গুল বুলিয়ে তেল-মশলা মাখিয়ে দিলে। আঙ্গুলে তেল-গুড় লেগে গেল। সে আঙ্গুলটা জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে আবার বইখানি নিয়ে বসলো। কোন্ অবধি পড়েছিল? এই যে "অরুণ কুমার পকেটে হাত দিতে হাতে ঠেকলো এক টুক্‌রো কাগজ।" ডিটেকটিভের পকেটে পিস্তলের বদলে কাগজের টুক্‌রো মানেই, ডাকাতের উড়ো চিঠি। অরুণ কুমারের আর এক পকেটে ছিল অন্ধকারে দেখবার জন্যে পোস্তদানার মতো দেখতে একরকমের সাদা গুঁড়ো বোঝাই একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি। ডিটেকটিভ ধুরন্ধর শিশিটা খুলেই একটু সাদা গুঁড়ো আঙ্গুলে নিয়ে প্রথমে জিভে ঠেকিয়ে তারপর কাগজের টুক্‌রোটিতে মাখিয়ে দিতেই তার ওপরকার অক্ষরগুলো দোকানের মাথায় নিওন সাইনের মতো জ্বলে উঠলো। সেদিকে তাকিয়েই অরুণ কুমারের মনে দেখা দিলে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! এ যে পদ্য! লেখা আছে—

"শোন ওরে পল্টু!
মুখে দেবো বল্টু;
পিঠে দিই কিল,
ছুঁড়ে মারি ঢিল;
পেটে দেবো খোঁচা—"

কিন্তু ওদিকে ছাদের পাঁচিলের মাথায় তখনই একটা দাঁড়কাক এসে বসায় পঞ্চুর পড়ার ব্যাঘাত ঘটলো। সে অমন রহস্যময় গল্পটা উল্টে রেখে ছুটলো কাক তাড়াতে। কিন্তু একে দাঁড়কাক, তার ওপর কলকাতার দাঁড়কাক, তাড়া খেলেও পালায় না। উল্টে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। পঞ্চু শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে বললে, "হুস।" কাকটা তাতে কেবল মাথা নিচু করলে, যেন ইঙ্গিতে দেখালে, "তোমার হুস আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।"

পঞ্চুও তাকে ছাড়লো না। তার কাছে ছুটে গেল। কাকটাও এবার গেল উড়ে। পঞ্চু নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসে আবার গল্পটা চিৎ করে পড়তে লাগলো। এই যে—

"তোর পেটে দেবো খোঁচা—"

আঃ! আবার এসেছে। কিন্তু পঞ্চু উঠতেই কাকটা একেবারে থালার পাশে বসলো। তারপর দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো একখানি ছড়া ঠোঁটে তুলে নিয়েই গেল উড়ে। পঞ্চু তার কিছুই করতে পারলো না। তবুও সে ছুটে গেল পাঁচিলের ধারে দেখতে কাকটা কতদূর গেল। গিয়েই দেখে, কাকটা ফন্টেদের চিলেকোঠার মাথায় বসে ছড়াটাকে পায়ে চেপে ধরে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছে।

রাগে পঞ্চুর গা জ্বালা করতে লাগলো। ঐ ফন্টেটার সঙ্গেই সেদিন ইস্কুল থেকে আসবার পথে এক সিনেমা স্টারকে নিয়ে তর্কাতর্কি, শেষে মারামারিও হয়েছিল। মারামারিতে পঞ্চু ঘা কতক— যাক্ সেকথা। সেই থেকে ফন্টের ওপর পঞ্চুর রাগ। সে কাকটাকে মারবার জন্যে ছাদে ঢিল খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সেই ডিটেকটিভ গল্পের বইখানা ও খানকয়েক থান ইট ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। ও দুটির একটিও ছুঁড়ে মারলে বিপদ। কারণ বইখানা স্থানীয় পাঠাগারের এবং থান ইটে মানুষ খুন হয়। সে অগত্যা পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে কাকটার উদ্দেশ্যে ঘুষি ছুঁড়ে, 'হুস হাস' করে শূন্যে আস্ফালন করতে লাগলো। এমন সময়ে ফন্টেদের ছাদে ঘাগরা শুকোতে দিতে এল ফন্টের বোন মান্টি।

সে পঞ্চুদের ছাদের দিকে তাকাতেই পঞ্চুর আস্ফালন দেখতে পেল। মনে করলে, পঞ্চু তাকেই কিল দেখাচ্ছে। অমনি সরু বাঁশির মতো গলায় চেঁচিয়ে বললে, "কিল দেখাচ্ছিস যে বড় ? আমি তোর কী করেছি ?"

যা বলা উচিত ছিল তা না বলে পঞ্চু বললে, "বেশ করছি।"

"বেশ করছিস !" বলে সেও জিভ বার করে পঞ্চুকে ভ্যাংচাতে লাগলো।

পঞ্চু বললে, "খাঁদী ! আবার বব্ করে চুল ছাঁটা হয়েছে।"

"বেশ করেছি ! তোর কী রে ? দাঁড়া মাকে বলে দিচ্ছি।" বলতে বলতে সে তরতর করে নেমে গেল।

কাকটার নজর এসবে ছিল না, সে ছড়াখানি গিলে চিলেকোঠার আলসেয় তখন ঠোঁট মুছছিল।

পঞ্চু থালাখানার কাছে এসে দেখে, একখানা ছড়া মাটিতে পড়ে আছে। সে ছড়াগুলো গুণে দেখে সেখানি নিয়ে এগারোখানি। কাকটা উড়ে যাবার সময়ে ছড়াখানি হয়তো তার পাখার ঝাপটায় থালার নিচে পড়েছে। ভাবলো, ধূলোবালি মাখা ছড়াখানা থালায় তুলে রেখে কী হবে ? মজলে খাবে তো তারাই। হয়তো তখন বাবা কী দাদার পাতে পড়বে। তারা ধূলোবালি মাখা দেখে খাবে না, ফেলে দেবে। তাতে নষ্ট হবে। খাবার জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া কী উচিত ? তার চেয়ে সেই এখন খেয়ে ফেলুক। এই ভেবে ছড়াখানি চুষে চুষে খেয়ে বীচিগুলো ছাদ টপ্‌কে নিচে ফেলে দিয়ে আঙ্গুল চাট্‌তে চাট্‌তে আবার সে "ডিটেকটিভ সম্রাট অরুণ কুমারের বাহাদুরী" নিয়ে পড়লো। আর অমনি দপ্‌দপ্ করতে করতে পিসী উঠে এলেন ছাদে। এসেই থালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "হ্যারে পেঁচো ! তুই বুঝি থালায় হাত দিয়েছিলি ? এই যে ভূঁয়ে তেলের দাগ !"

পঞ্চু বললে, "আমি কেন হাত দেবো ? কাকে খেয়েছে ?"

"কাকে খেয়েছে ? বললেই হল ? বারোখানা ছড়ার মধ্যে রয়েছে মোটে দশখানা। আর দুখানা তুই খেয়েছিস ?"

"যে খেয়েছে সে ঐ যে দেখো তোমার পেছনে—"

পিসী ফিরে দেখে ছাদের পাঁচিলে একটা দাঁড়কাক হাঁ করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পিসী তার দিকে তাকাতেই সে হাঁ আর একটু বড় করলে। ভাবটা যেন এই—"দেখো আমার হাঁ। আমি খাইনি। খেয়েছে ও।"

পিসী বললে, "বেড়ালকে মাছ আগলাতে দিয়ে গেছলুম। ঝকমারি হয়েছে। মনে করতুম, ছোঁড়াটা দেখতে হাঁদা-ভোঁদা ভাল-মানুষ। এখন দেখছি হাড় শয়তান।" বলতে বলতে থালাখানি তুলে নিয়ে পিসী তর তর করে নিচে নেমে গেল। কাকটাও বোধহয় মনের দুঃখেই গেল উড়ে।

পিসীর কথায় পঞ্চুর অভিমান হলো। সেও "অরুণ কুমারের বাহাদুরীর শেষটা না দেখেই বইখানি বগলে করে নেমে গেল নিচে একেবারে ভৃত্য সীতানাথ যেখানে বসে বাটনা বাটছিল সেখানে। গিয়েই বললে, "সীতানাথ, খানিকটা বাটনা দাও তো।"

সীতানাথের মেজাজ ভাল ছিল না। সে দু' আনার কাপড় কাচা রটে আনতে গিয়ে কড়মড়ে বিস্কুট এনে গিন্নীমায়ের কাছে সদা বকুনি খেয়েছে। তাই হলুদগুলোকে শিলে ফেলে নোড়া দিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে ছেঁচছিল। চেঁচিয়ে বললে, "বাটনা কি করবে, আঁই?"

পাশের ঘরে ছিলেন গিন্নীমা। শুনতে পেয়ে বললেন, "কে বাটনা চায় রে?"

সীতানাথ বললে, "খোকাবাবু।"

গিন্নীমা বললেন, "বাটনা কি হবে? এই পঞ্চু—"

পঞ্চু কোন উত্তর দিলে না, সীতানাথের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে গেল এবং একটু পরেই মাথায় জবজবে করে সুগন্ধি নারকোল তেল মেখে কলঘরের দিকে চললো।

ছোটদি সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখেই খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললে, ওমা! দেখো পঞ্চা কি রকম করে মাথায় তেল মেখেছে—দু' রগ আর পিঠ দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে।"

পঞ্চু বললে, "বোতলে তেল বলে ছিলই না।"

গিন্নীমা বললেন, "ওর যা খুশি করুক। ওর জ্বালায় আর পারিনে বাপু। বোতলটাও ভেঙেছে কিনা দেখ্।"

পঞ্চু বললে, "বোতল ভাঙবো কেন? ঐ তো ওদিকে রেখে এসেছি।" বলেই সে কলঘরে গিয়ে নেয়ে এল। তারপর চুল আঁচড়ে গেল মেজ কাকীমার ঘরে।

মেজ কাকীমা তখন খুকুকে কোলে শুইয়ে তার জন্যে দুধ তৈরি করছিলেন। পঞ্চুকে মেজ কাকীমা একটু ভালোবাসেন। ছেলেটা তাঁর ফাই-ফরমায়েজ খাটে। সেজন্যে তাকে মাঝে মাঝে দু-চারটে পয়সা ও এটা-ওটা খেতে দেন। গতকাল চকোলেট খাবার জন্যে দিয়েছিলেন চারটি পয়সা।

পঞ্চু তাঁর সামনে উবু হয়ে বসে দুধের বোতলটা হাতে নিয়ে বললে, "মেজ কাকীমা! এ দুধ খেলে গায়ে জোর বাড়ে, মোটা হয়?"

খুকু কাঁদছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "তা হবে।"

"আমার আজকাল কি হয়েছে জান? গা-হাত-পায়ে জোর পাই না, কেবল ঘুম পায়। ক্লাসের ছেলেরা বলে, রোগা হয়ে যাচ্ছি।"

মেজ কাকীমা একটু মুচকে হাসলেন।

পঞ্চু বললে, "একটু দুধ খাবো?" এবং মেজ কাকীমার সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে তৎক্ষণাৎ বোতলটা হাতে উপুড় করে সব দুধ ঢেলে মুখে পুরলো। দুধের গুঁড়ো তার মুখে লাগলো, মেঝেয় পড়লো।

মেজ কাকীমা বললে, "অতটা দুধ খেয়ে ফেললি? খুকু খাবে কি?"

"কতটুকু ছিল? একগালও হলো না। টাকা দাও। আমি মানিকদার দোকান থেকে এখুনি কিনে এনে দিচ্ছি। দেবে টাকা?"

মেজ কাকীমা বললেন, "একটু পরে এস।"

"আর আমায় চারটে পয়সা? অ্যাঁ? আমি এক সপ্তাহের মধ্যেও আর চাইবো না।"

কাকীমা আবার মুচকে হাসলেন; বললেন, "ক'দিনে তোর সপ্তাহ হয়?"

তারপর পঞ্চু গিয়ে বললে, "মা, ভাত দিতে বল।"

অন্যদিন সে পিসীর কাছে চায়।

মা ধমক দিয়ে বললেন, "একটু সবুর কর। আজ রবিবার। এত তাড়া কিসের? রান্না না হলে তোমায় খেতে দেবে কি করে?"

তবু পঞ্চু শান্ত হলো না। রবিবার হলেও সে তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর সে কখন ফিরে এল, কি করলো কেউ খোঁজ রাখলো না।

ক্রমে দুপুর হলো। সবাইয়ের খাওয়া-দাওয়া চুকলো, হেঁসেল উঠলো। যে যার পছন্দ মতো জায়গাটিতে গিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো। কলঘরের চালে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছিল। তাতে পা-চারখানা ছড়িয়ে, চোখ দুটি বুজে দেহ এলিয়ে আরামে শুয়ে ছোটদির বেড়ালটাও বিশ্রাম করতে লাগলো। জেগে রইলো কেবল পঞ্চু আর উচ্ছিষ্ট-লোভী গোটা কয়েক কাক। কিন্তু সকলে সত্যি ঘুমিয়েছে কিনা পরখ করতে পঞ্চু বার কয়েক হাততালি দিলে। কেউ তাকে ধমকালো না দেখে সে নিশ্চিন্ত হলো।

তারপর দুপুর গড়িয়ে গেল; কলে জল এল। সীতানাথ উঠে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে পড়লো। পিসী উঠে চশমা চোখে দিয়ে কাঁথা সেলাই করতে বসলো। পঞ্চুর বাবা বৈঠকখানায় গেলেন। বাড়িতে চলাফেরা, সাড়া শব্দ শুরু হলো।

সন্ধ্যার কাছাকাছি পিসী গেল উনুনে আগুন দিতে। আর সীতানাথকে গিন্নীমা একটা খবর দিয়ে তাড়াতাড়ি পাঠালেন বৈঠকখানায় কর্তার কাছে।

সীতানাথ ছুটতে ছুটতে গিয়ে বললে, "বাবু। শীঘ্র ভিতরে আসুন। খোকাবাবুর পেটে কি হইছেন।"

"অ্যাঁ। বলিস্ কী রে? বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোক যতটা পারলেন ততটা তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে দেখেন পঞ্চু পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে।" শীতকালেও তার গা দিয়ে ঘাম ঝরছে।

তিনি জিগ্যেস করলেন, "কী! কী ব্যাপার?"

বাড়ির কাছে একটি ছেলে দিনকয়েক আগেই কলেরায় মারা গিয়েছিল। তাই তাঁর ভয় হলো—হয়তো-বা কলেরা। জিগ্যেস করলেন, "বাইরে কোথায় কি খেয়েছিলে?"

পঞ্চু কাতর স্বরে উত্তর দিলে, "বাইরে কোথাও কিছু খাইনি।"

তার মা বললেন, "খাবে আর কোথায়? বাড়িতেই তো ছিল। এখুনি একটা ডাক্তার ডাকো।"

"ডাক্তার? কাকে পাঠাই? ছেলেরা—"

ছেলেরা মানে পঞ্চুর দুই দাদা। সেদিন রবিবার। সিনেমায় নতুন ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। তার দু-একটা গান এর মধ্যেই কলকাতার ছেলে-মেয়েদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। ভারি ভিড় হচ্ছে—টিকিট একরকম পাওয়াই যায় না। তাই তারা বেরিয়েছে দুপুরে। ভদ্রলোকেরও পায়ে বাত। তবুও লাঠি ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললেন ডাক্তার ডাকতে। সৌভাগ্য যে তাঁকে বেশি হাঁটতে হলো না। গলির মোড়েই ডাক্তারের দেখা পেলেন। গলায় স্টেথিস্‌কোপ ঝুলিয়ে, হাতে ব্যাগ ডাক্তারবাবু চলেছিলেন তাঁর চেমবারের দিকে। পাড়াতেই থাকেন, পঞ্চুর বাবাকেও চেনেন। তাই ডাকামাত্র সঙ্গে সঙ্গে এসে রোগীর ঘরে ঢুকলেন এবং রোগের লক্ষণ শুনে রোগীর পেটে প্রথমেই মারলেন আঙুলের এক খোঁচা। তারপর স্টেথিস্‌কোপটা কানে গোঁজবার আগে দুহাতে বেড়ির মতো ধরে পঞ্চুকে জিগ্যেস করলেন, "কী খেয়েছিলে?"

পঞ্চু মুখ বেঁকিয়ে বললে, "কিছু না।"

"আজ কিছুই খাওনি?"

"খেয়েছি।"

"কী?"

"ভাত, ডাল, মাছ—

"আর ?"

"আর—ছড়া তেঁতুল—"

"ছড়া তেঁতুল ? ক'খানা ? জিভ দেখি—"

কিন্তু পঞ্চু জিভ বার করবার আগেই পঞ্চুর বাবা বলে উঠলেন, "যত অখাদ্য-কুখাদ্য তৈরি করেন আমার দিদি। খেলে তিন দিন পেটে—"

ডাক্তারবাবুর কানে তখন স্টেথিস্কোপ গোঁজা, তিনি রোগীর বুক পরীক্ষা করছিলেন। কাজেই কথাগুলো শুনতে পেলেন না।

তিনি যখন বইয়ের থলে কাঁধে ঝুলিয়ে হাফপ্যান্ট পরে সঙ্গীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ইস্কুলে যেতেন-আসতেন তখন থেকে পিসী তাঁকে দেখে আসছেন। কাজেই সংকোচ বোধ না করে ডাক্তারবাবুর সামনে এসে বললেন, "পঞ্চানন কতটুকুন ছড়া তেঁতুল খেয়েছে যে ওর পেট ব্যথা করবে ? যা খেয়েছে তাও তো আমার কড়ে আঙুলের মতো সরু। এই আমি থালা শুদ্ধু এনে দেখাচ্ছি।" বলে পিসী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পিসীর মুখে পেঁচোর বদলে 'পঞ্চানন' শুনে পঞ্চুর সেই যন্ত্রণাতেও আনন্দ হলো। পিসী তাহলে তাকে ভালবাসে ?

ডাক্তার রোগী দেখে, ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

ওদিকে পিসীও রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই একরকম আর্তনাদ করে উঠলেন ঃ বললেন, "থালায় ছড়া তেঁতুলের বদলে পচা গোবর। উঃ! কি বিটকেল গন্ধ! ছড়াগুলো সব গেল কোথায় ? নিশ্চয়ই পেঁচো খেয়ে এই গোবরের মতো কী রেখে দিয়েছে। পেঁচোর পেট ব্যথা করবে না তো করবে কার ? আর হরচন্দ্র বলে, যত কুখাদ্য তৈরি করি আমি।" বলতে বলতে পিসী থালাখানা উঠোনে নামিয়ে দিয়ে কলঘরে ঢুকলো বোধহয় নাইতে।

পঞ্চু তখন পেটের যন্ত্রণায় আরও বেশি কাতরাতে লাগলো।

তারপর ওষুধ খেয়ে কিছুটা সুস্থ হলে একটু রাত্রের দিকে পঞ্চুর ছোটদি জিগ্যেস করলে, "ক'খানা ছড়া তেঁতুল খেয়েছিলি রে ?"

"এগারোখানা।"

"অ্যাঁ! তবে পাথরের থালায় যা ছিল তা তুই রেখেছিলি?"

"হুঁ!"

"ওগুলো কী?"

"আমার তৈরি ছড়া তেঁতুল। পিসীর একখানা খেয়েছিলুম বলে পিসী আমায় বকেছিল। আমি তাতে অপমানিত বোধ করে পিসীকে একখানার জায়গায় পনেরোখানা ছড়া তৈরি করে দিয়েছিলুম। আর বাকি দশখানা খেয়ে ফেলেছিলুম। সেগুলো তো আমার আর কাকের এঁটো ছিল। তোমরাই তো বল, "গুরুজনদের খাবার জিনিস এঁটো করতে নেই?"

"তেঁতুল পেলি কোথায়? কী দিয়ে তৈরি করেছিলি?"

"খুকুর দুধের আর মায়ের তেলের বোতল বেচে পেয়েছিলুম ছ'পয়সা। মেজ কাকীমা দিয়েছিল চার পয়সা। তাই দিয়ে বাজার থেকে তেঁতুল কিনে এনে, তেল, নুন আর সর্ষে, লঙ্কা, ধনেবাটা দিয়ে গুড় মাখিয়ে তৈরি করেছিলুম।"

দিদি হেসে বললে, "সঙ্গে পাঁচফোড়ন, কালজিরে আর গোলমরিচ দিলিনে কেন?"

"পেলুম না যে!"

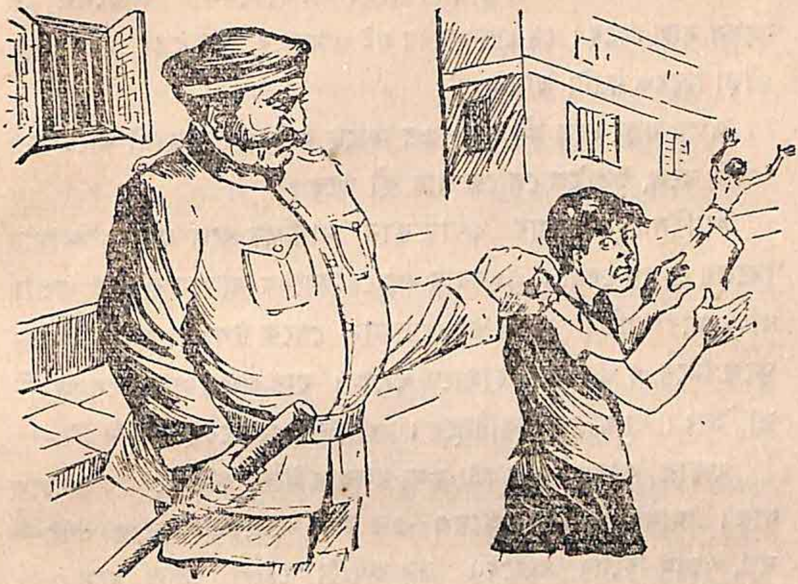
"কেমন হয়েছিল?"

"ঐতো শুনলে, পিসী বললে, গোবর।"

"দেখগে সেই কাকটাও পিসীর ছড়া তেঁতুল খেয়ে এতক্ষণে মেডিক্যাল কলেজের ছাদে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে।"

পিসী পঞ্চুর ছোটদিকে দেখতে পারে না। তাকে বলে, রণচণ্ডী। কিন্তু ছোটদির আসল নাম রঞ্জাবতী।

তার শেষের কথাগুলো কানে যেতেই বললে, 'মেয়ের মুখ দিয়ে মিষ্টি কথা বেরোয় না! আবার নাম রাখা হয়েছে রঞ্জাবতী! উচ্ছেলতা—উচ্ছেলতা—'



নামে কী আসে যায় ?

ওটা ছাড়া ওর খুব ভাল নাম একটা আছে। কিন্তু ছেলেবেলার অনেক মুশ্‌কিলের একটা হচ্ছে, ভাল নাম ধরে কেউ ডাকে না। ওর দাদার নাম ছিল টক্কা। তার দাদার নাম ছিল লক্কা। লক্কা-টক্কা মারা যাবার পর ও হয়। তাই ওর দিদিমা ওই নামটি রেখে কয়েকদিন পরেই অক্কা পান।

কিন্তু নামে কী আসে-যায় ? আবার কখন কখন নামের ঠেলাও সামলানো দায় হয়ে ওঠে। যেমন হলো সেবার। ফক্কার মামা বজ্রপাণিবাবু অফিসের ছোট সাহেব থেকে বড় সাহেব হওয়ার আনন্দে জনকয়েক চোখা চোখা বন্ধুকে খাওয়াবেন বলে, ফক্কাকে কাঁচাগোল্লা আর দই আনতে পাঠালেন হাবড়া। দশ সের কাঁচাগোল্লা আর দশ সের দইয়ের দাম তো দিলেনই, সেই সঙ্গে গাড়ি ভাড়া, মুটে ভাড়া, রিক্‌শা ভাড়া মানে বাড়ি ভাড়া ছাড়া পথে যত রকমের

ভাড়া লাগতে পারে সব দিলেন হিসেব করে। দিয়ে বললেন, 'গোষ্ঠ ময়রার দোকান। বলবি, পাণিসাহেব পাঠিয়েছেন। তাহলেই সে সরেস মাল দেবে। ওর দোকানের দই এমন যে, ছুরি তো ছেলেমানুষ খাঁড়া দিয়েও কাটা যায় না।'

নামে ফক্কা হলে কী হয়, ওর কাছে কারো ফক্কিকারী খাটে না। অমনি বলে, "তা'লে লোকে খায় কী করে?"

পাণিসাহেব ভাগ্নের কথায় কান না দিয়ে বলে যান, "আমার নিজের চোখে দেখা। একবার ওর দোকানের সামনে দু' দল গুণ্ডায় বাধে মারামারি। তারা ওর দোকান থেকে টপাটপ দইয়ের ভাঁড় তুলে নিয়ে এ ওর দিকে চালাতে থাকে। যার গায়ে লাগে সে অমনি মাটিস্থাৎ। যা যা দেরি করিস্‌নে। পাঁচটার ভেতরেই ফিরবি।"

ফক্কার আরও দু-একটা কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু চেপে যায়। মামা বড় সাহেব হয়েও এত কথা বলেছেন! তার ওপর— নাঃ, পথেই হিসেব করবে। তবু কথাটা ঠেলে ঠেলে মনে ওঠে যেন কই মাছ, জলের ভেতরে কিছুতেই থাকতে চায় না। হাবড়া যেতে-আসতে এত লাগবে? বড় সাহেবী নজর বলেই, মামার হিসেবও লম্বা-চওড়া হয়ে থাকবে। সে হাবড়ার পথ ধরে। সঙ্গে চাকর রাধাকিষেণ।

তারপর চারটে বেজে যখন সাত মিনিট একখানি রিক্‌শা খটর্-খটর্ করতে করতে এসে ঠক্ করে ফক্কাদের বাড়ির সামনে থামে। মালপত্তর নামিয়ে, ভাড়া চুকিয়ে বাড়ি ঢুকতেই শুড়শুড়ি দিয়ে ফক্কার নাকে ঢোকে পাঁঠার গন্ধ। ফক্কা একবার ঠোঁঠ চেটে মনে মনে বলে, "ফাউল হলেই মজা হতো।"

মামা বারদিককার ঘরে (কদিন থেকে ঘরখানাকে বলা হচ্ছে, ড্রইংরুম) বসেছিলেন। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বলেন, "মনে করেছিলুম, তোর দেরি হবে, কিন্তু দেখছি আগেই—আরে এ কী? এ তো সে ভাঁড় নয়। সে যে ঠিলের মতো লম্বাটে। কার দোকান থেকে এনেছিস্?"

ফক্কা বলে, "যে দোকানের নাম করেছিলেন। গোষ্ঠ মরে গেছে। তার ভাইপো জটেশ্বর এখন দোকান চালায়।"

"গোষ্ঠ মরেছে? কালই যে তাকে দেখেছি। বড়বাজারে চিনি, সফেদা, শালপাতা কিনতে এসেছিল। অমন কালাপাহাড়ের মতো চেহারা। সহজে মরে? কোন্ দোকানে গিয়েছিলি বল্‌তো?"

"কেন, স্টেশনের সামনে ঘাটের ওপরেই যে দোকানখানা। যেখানে দোতলা বাস দাঁড়ায়।"

"আরে, হাবড়ায় ঘাট, দোতলা বাস এসব তুই পেলি কোথায়?"

"মামা, কী বলছেন? হাবড়া স্টেশনের পুবে গঙ্গা। তার এপারে কলকাতা, একথা কে না জানে? আপনার কথামতোই হাবড়া থেকে দই-কাঁচাগোল্লা এনেছি। এখন—" বলতে বলতে ফক্কার গলা ধরে আসে।

মামা বলেন, "মুখ্যু কোথাকার! হা—বড়া নয়—হাব্—ড়া, হাব্—ড়া। বনগাঁ লাইনে মস্ত বড় স্টেশন। লোকে যার নাম দিয়েছে, গোমো-হাব্‌ড়া। আজকের ভোজটাই মাটি করে দিলি। এর চেয়ে আমাদের গলির মোড়ে ভীমে ময়রার দোকানেও যে ভাল দই-মিষ্টি পাওয়া যায়। এ জিনিস কী করে ভদ্দরলোকদের দি বল্‌তো? পাতে দিতে দিতে যখন বলা হতো, হাব্‌ড়া থেকে আনিয়েছি, তখন ওর তার আরও বাড়তো। নামের এমনি গুণ, বুঝলি গবেট?"

ফক্কা বলে, "ও—সেই গোবরডাঙার কাছে যেখানে—আচ্ছা মামা, ও রকমের দই-সন্দেশ তো ছোটলোকের জন্যে। তাহলে এগুলো চাকর-বাকর দিয়ে ভীমে ময়রার—"

"থাম্, গাধা।"

ফক্কা বাকি কথাগুলো গিলে ফেলে।

এ তো একটা জায়গার নাম নিয়ে কাণ্ডটা হলো। আর মানুষের নাম নিয়ে যে কাণ্ড হয়, তা লিখতে গেলে ছটা কলম, এক পিপে

কালি আর সাড়ে তিন মণ কাগজের দরকার। সে আমি কোথায় পাবো? তাই আর লিখলাম না।

কিন্তু নামে যাই হোক কাজে-কর্মে ফক্কা একদম পাক্কা। তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আগে যেটা দিয়েছি সেটা কিন্তু তার মধ্যে পড়ে না।

ক্লাসে একদিন রামায়ণের গল্প নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ফক্কা উঁচু ক্লাসের ছাত্র। উঁচু ক্লাসে পড়া হয় না, আলোচনা হয়।

স্যার ফক্কাকে জিগ্যেস করেন, "তরণী সেন কে ছিলেন বলতে পার?"

ফক্কা অমনি বলে ওঠে, "বল্লাল সেনের ছেলে। মোহম্মদ ঘোরির সঙ্গে ফরাক্কাবাদের যুদ্ধে খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে গঙ্গা পার হবার সময় ডুবে মরেন।"

স্যার বলেন, "সাবাস্!"

ক্লাসশুদ্ধ ছেলেরা হাঁ।

ফক্কা বুক ফুলিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে।

খেলার বিষয়ের যা-কিছু ফক্কা সব জানে। মাত্র মাস কয়েক আগের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তানকে ঘায়েল করে খেলতে এসেছে ভারতে। অস্ট্রেলিয়ার ও'নিল ও বেনো আদুরে বাঙালি খোকার মতো হয়েছে অনিল আর বেণু। কিন্তু ফক্কার এটা ভাল লাগে না। দেশের লোকের প্রশংসা না করে বিদেশীর গুণ যে করে সে দেশপ্রেমিক নয়। বন্ধুদের কাছে একদিন তার মনের কথা বলেও ফেলে। কথাটা যে ঠিক ফক্কার তা নয়। বলেছে তার মাসতুতো দাদা, খেলার মাঠে এক গেটকীপার ঝণ্টু বাঁড়ুজ্যে। তার সঙ্গে তো ফক্কার সাথীদের আলাপ নেই। আর সে যার-তার সঙ্গে আলাপও করে না। গেটকীপারকে সর্বদা ভারিক্কী চালে চলতে হয়, হাই সারকেলে মিশতে হয়। কিন্তু বন্ধুরা মনে করে, কথাটা ফক্কারই।

ফক্কা বলে, "বেণুর চেয়ে সুভাষ গুপ্ত অনেক ভাল বোলার। ওঁর

পূর্ব পুরুষ কে জান? কবি ঈশ্বর গুপ্ত। ওদেরও বাড়ি ছিল হালিসহরে। তোমরা নিজের দেশের কাউকে তো প্রশংসা করবে না! ঝণ্টুদা বলেছে, সুভাষ গুপ্তর একখানা 'লাইফ' লিখবে। আর লালা অমরনাথ হচ্ছেন আসামের লোক। আসামের একজন কে লালা নাকি ওঁর কে হ'ন?"

একজন বলে, "গুল দিচ্ছ?"

ফক্কা বলে, "ও কাজ ফক্কা চৌধুরী করে না। ওসব করিস্ তোরা। যখন গুলে কুলোয় না তখন চালাস ঘুঁটে। ধোঁয়ায় টেকা দায়।"

আর একজন বলে, "তাহলে বল্ মোদী হচ্ছে ছিদাম মুদীর বংশধর।"

ফক্কা বলে, "দ্যাখ বোদে, ঘুঁটে ছাড়বারও জায়গা আছে।"

বোদে বলে, "বেশি গুলেও আঁচ ওঠে না। তুই নামেও ফক্কা, জানিস্‌ও কাঁচকলা।" ফক্কা রাগে কেঁপে ওঠে রুখে দাঁড়ায়।

বোদে তাকে দেয় এক ধাক্কা। ফক্কা চীৎ হয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলায়। তারপর বোদেকে পাল্টা ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখে, সে হাওয়া। সেই থেকে বোদের ওপর ফক্কার রাগ।

সে তক্কে তক্কে থাকে কখন বোদেকে বেকায়দায় পাবে। কিন্তু বোদে খুব সেয়ানা। কখন একা থাকে না।

শেষে ফক্কা একদিন একখানা বই পড়তে পড়তে খুব ভাল একটি নীতিবাক্য পেয়ে গেল। বাক্যটি হচ্ছে এই যে, "তোমার এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিবে।" বাক্যটি নিয়ে ফক্কা অনেকক্ষণ ভাবে। আর একগাল ফিরানো মানেই তো প্রায় পিছন ফেরা। তারও মানে পালানো। অতএব সেদিন সামনে ধাক্কা খেয়ে পিঠ ফিরানো মানে পালানো উচিত ছিল। তবু কথাটা পরিষ্কার হয় না। মার খেলে রাগ হয়। মনে রাগ থাকলে লড়াই করতে ইচ্ছা জাগে। পাল্টা মার মারতে মন নেচে ওঠে, হাত-পা নিশ্‌ নিশ্‌ করে। ঐ বইতে ছিল, "ক্রোধ দমন করিবে। সকলকে এমন কী শত্রুকেও ভালবাসিবে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বোদেকে সেদিন ভালবাসাই উচিত ছিল।

এমনি খট্‌কা মন নিয়ে ফক্কা ঘুরে বেড়ায়। এমন সময়ে তাদের ইস্কুলের হলো পূজোর ছুটি। ফক্কা মামীর সঙ্গে চলে গেল বিহারের একটি জায়গায়। সেখানে গিয়ে একদিন চড়ে এক্কা। এক্কাকে টেক্কা দেয় এমন গাড়ি ভূ-ভারতে নেই। সে ছবিতে দেখেছে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে রথীরা এই ধরনের গাড়িতে চড়ে যুদ্ধ করছেন। তবে তার চূড়া আছে। কিন্তু এখনকার এক্কাগুলোর চূড়া নেই। গাড়ি ছোটার সময়ে সারা দেহের খিল খুলে যাবার মতো হলেও ফক্কা ভারি খুশি। ভাবছে সে চড়েছে অর্জুনের রথে। যদি ঐ বিড়িখেকো বিহারী গাড়োয়ানটার বদলে শ্রীকৃষ্ণ থাকতেন আর ফক্কা যদি হতো অর্জুন তাহলে এখনই গিয়ে কোথাও একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিত।

মামী তাকে হুঁশিয়ার করে দেন ; বলেন, "ছটফট করছিস্ কেন ? পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে এক কাণ্ড বাধাবি ?"

ফক্কা ক্ষুণ্ণ হয়। চুপ করে বসে ভাবতে থাকে। মনে মনে বলে, ঘর-সংসারের কথা ছাড়া মামী আর কিছু বোঝে না। এসে ইস্তক বাজারে কোথায় কী পাওয়া যায় তারই খোঁজ হচ্ছে। সেদিন আবার শিখানো হলো, আগে পেটকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নইলে কিছুই হবে না।

যা হোক, এক্কা থেকে নেমেই ফক্কা বলে, "মামী কী খাবো ? যে গাড়িতে চড়ে এসেছি তার ঝাঁকুনিতে পেটের নাড়ি শুদ্ধ্‌ হজম।"

মামী বলেন, "যে জায়গায় এসেছি সেখানে খেতে চাইলেই খাবার দেওয়া যায় না। কাল ভাল ছোলার ছাতু কিনেছি। তাই তেল-নুন মেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাও।"

ফক্কা মুখ বাঁকায়। কিন্তু "পেটের জ্বালা বড় জ্বালা"। শেষে ছাতুই খেতে হয়।

কালী পূজোর আগেই ফক্কা মামীর সঙ্গে কলকাতায় ফেরে। এসেই দেখে, রাস্তায় বাজি পোড়ানো নিষেধ। পোড়ালে জেল ও জরিমানা। এমন কত নিষেধ তো কত জায়গায় থাকে। কে শোনে? রেলগাড়ির চেন অকারণে টানা নিষেধ, কিন্তু কে তা শোনে?

বাড়িতে ছুঁচোবাজি, পটকা পুড়িয়ে কী আনন্দ হয়? তাই পূজোর সন্ধ্যেয় এক হাকিমের বাড়ির সমুখে ফক্কারা ক'জন মিলে স্ফূর্তি করে পট্‌কা পোড়ায়, উড়ন তুবড়ি ওড়ায়। মেমসাহেব মানে হাকিম গিন্নী জানলায় দাঁড়িয়ে রোশনাইয়ের মজা দেখছেন। আর একটা তুবড়ি গিয়ে ঠক্ করে লাগে জানলার মাথায়। লেগেই ফট্ করে ফেটে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাউ মাউ চীৎকার, এক জোড়া পাহারাওয়ালার তাড়া, দুপ্ দাপ পায়ের শব্দ।

সবাই পালায়, কেবল ফক্কা পারে না। বিহারী পাহারাওয়ালা মোটা মোটা আঙুল দিয়ে তার শার্টের কলার চেপে ধরে থানায় নিয়ে হাজির করে একেবারে বড়বাবুর সামনে।

সেখানে তখন ছোটবড় অনেকগুলো একই অপরাধের অপরাধী দাঁড়িয়ে। বড়বাবুর মেজাজ বিগড়ে আছে।

ফক্কাকে দেখেই বলেন, "এই একটা। এই তোর নাম কী?"

—"ফক্কা।"

—"ইয়ার্কি মারবার আর জায়গা পাওনি?" বলেই তার গালে মারেন এক চড়।

—"ঠিক করে বল কী নাম।"

—"ফক্কা।"

—"এই দশাননজী! এর ঘাড়ে দুটো রদ্দা লাগা। দিল্লাগি বার করছি। এতটুকু পুঁচকে ছোঁড়া।"

হুকুম শুনেই ফক্কার ঘাড় কন কন করে ওঠে।

থানার একজন বলে, "স্যার! ওটা বোধহয় ওর খারাপ মানে ডাকনাম। কী রে। তাই না?"

—"হ্যাঁ স্যার।"

বড়বাবু বলেন, "বেটার মুখখানা দেখ না। দেখলেই মনে হয় উঠতি গুণ্ডা। এঃ! আবার হাউই শার্ট, ভেলভেটের প্যাংলুন পরা হয়েছে! কোন বস্তিতে থাকিস্? ঠোঁট কালো কেন? বিড়ি খাস? নিশ্চয়ই খাস।"

সেই নীতিবাক্যটি ফক্কার মনে পড়ে—তার মনে হয়, বড়বাবুকে ভালবাসা উচিত। সে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ভালবাসা জানাবার আগেই তিনি ধাঁই করে তার পিঠে বিরাশী শিক্কা ওজনের এক চড় মেরে বলেন, "যা। ফের যদি দেখি তো—"

পরেরটুকু ফক্কা আর শুনতে পায় না, শুনতেও চায় না। এক ছুটে থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ি। কিন্তু পুলিশে ধরার খবর বিদ্যুতের চেয়েও জোরে চলে। বাড়ি এসেই দেখে বজ্রপাণিবাবু রুদ্রমূর্তিতে বসে। তাকে দেখা মাত্র গুম্ গুম্ শব্দে বলেন, "যত সব বদ ছেলের সঙ্গে মিশে গোল্লায় যাচ্ছো? আইন অমান্য? হাকিম সাহেবের স্ত্রীর মুখে আগুন? আমার নাম ডোবানো? তোকে আজ—"

মামী তাড়াতাড়ি ফক্কাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলেন, "আহা কী করছো? বচ্ছরকার দিন ছেলেটাকে মারছো? শুনেছি তুমিও তো ছেলেবেলায় লোকের গায়ে ছুঁচোবাজি ছুঁড়ে দিতে।"

মামা অমনি চুপ।

মামী বলেন, "আইনের কথা আর বলো না। ঘেন্না ধরে গেছে।" কথায় বলে,

"যার খাই, তার পরি, তারই আমি রাজা;
আইনের নামে করি প্রাণ ভাজা ভাজা।"

মামা অফিসের বড় সাহেব। আইনের নিন্দা সইতে পারেন না, মোটা চুরুট ধরিয়ে কড়া ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গট্ গট্ করে বেরিয়ে যান।

আর ফক্কা? মামীর পায়ে ঢিপ্ করে এক প্রণাম।

সবেরই শেষ আছে। তাই পূজোর ছুটিরও শেষ হলো।

ছেলেরা এলো ফিরে।

বোদের ধাক্কা ফক্কার মনে আছে। কিন্তু পাল্টা ধাক্কা দেবার ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে না থাকলেই যে সাচ্চা কাজ হয় তা নয়।

ক্লাসে যেতে যেতে বোদে ফক্কাকে দেখিয়ে কয়েকজনকে বলে, "জানিস, ওকে কালীপূজোর দিন পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

—"কেন রে, কেন ?"

—"পকেট মেরেছিল বলে।"

শুনে ফক্কা ওঠে ক্ষেপে। কিন্তু বোদেকে ধরবার আগেই বোদে ক্লাসে ঢুকে পড়ে।

তারপর থেকে সে বোদেকে ধরবার ফিকিরে থাকে, কিন্তু বোদেও এড়িয়ে চলে। শেষে বোদে তার বাবার সঙ্গে চলে গেল মুর্শিদাবাদে। ফক্কার সব রাগই হলো ফক্কা।

তাতো হলো, কিন্তু ফক্কার পকেটমার নাম যে ঘোচে না, কাঁঠালের আঠার মতো লেপ্টে থাকে। যে নির্দোষের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটায় সে খুনীর চেয়েও জঘন্য। কোন খারাপ কাজই তার আটকায় না।

ফক্কা মামীকে বলে, "আর ও ইস্কুলে পড়বো না।"

মামী বলেন, "কেন ?"

ফক্কার মনের দুঃখ জানায়।

মামী বলে, "কী অন্যায় ছেলেগুলোর !"

মামা সব শুনে বলেন, "ওর বেশিদূর লেখাপড়া হবেও না।"

—"তবে কী করবে ?"

—"টরে টক্কা।"

—"সে আবার কী।"

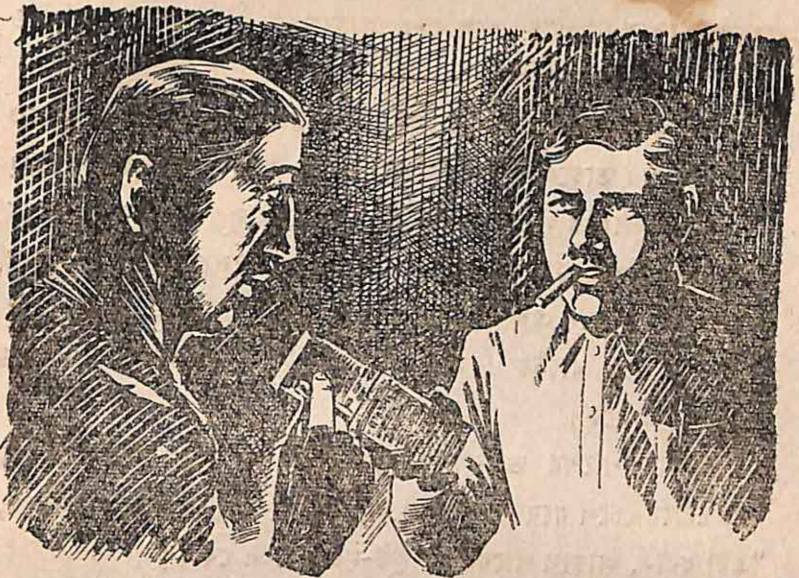
মামা আবার বলেন, "টরে টক্কা টরে টক্কা, টক্কা টক্কা টরে টরে।"

শুনে ফক্কা মুচকে হাসে। মামা চলে গেলে মামীকে বলে, "টরে টক্কা করবো। মামার যখন ইচ্ছে।"

—"আচ্ছা, ঢের হয়েছে। থামো। বোঝ কিছু? তোমার বুদ্ধিকে বিদ্রূপ করলেন। মন দিয়ে পড়ে 'ভালছেলে' এই নাম কেনো তো। তাহলে কেউ কিছু বলবে না।"

ফক্কা তাই মন দিয়ে কষে পড়ে। ফলে বোদের দেওয়া বিশ্রী নামটাও সকলে প্রায় ভুলতে বসেছে।

তাই বলছি, নামে কী আসে যায়?



পারঘাটের আলাপীর পাল্লায়

ফিরছি মালদা থেকে। খাজুরিয়া ঘাটের একটা স্টেশন আগেই কালবৈশাখীর মেঘের মেলা উত্তর-পশ্চিম আকাশ জুড়ে বসে গেলো এবং খাজুরিয়া ঘাটে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই ঝড় এলো, বৃষ্টি নামলো। ফলে যে দুর্ভোগ ভাগ্যে জুটলো তা আর বলতে চাই না। খেয়া লন্‌চের সঙ্গে বাঁধা ফ্ল্যাটে বসে যে গল্পটি শুনেছি সেইটিই লিখছি।

খাজুরিয়ার এপারে ফরাক্কা—মাঝে বয়ে চলেছে গঙ্গা। রেলের যাত্রীদের গঙ্গা পারাপার করতে হয়, রেলের লন্‌চে বা বে-সরকারী লন্‌চ-টানা ঐ ফ্ল্যাটে।

ভিজতে ভিজতে ঝড়ের ঝাপটায় বেসামাল হয়ে একখানি ফ্ল্যাটের একটি বেঞ্চের একটু জায়গা দখল করে তো বসেছি। সজল শীতল প্রবল বাতাসে শীতে কাঁপছি—কেবল আমি নয়, সকলেই। সকলেই আশা করছি, ওপারে পেঁৗছে রেলগাড়ির একটা কামরায় ঢুকতে পারলে, সেই দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি পাবো।

এমন সময় শুনলাম, সারেং লন্‌চ ছাড়তে সাহস পাচ্ছে না।

বলছে বাতাস না পড়ে এলে লন্‌চ ছাড়বে না। কারণ, মাঝ-গাঙে ভরাডুবির বিশেষ সম্ভাবনা।

দুর্দশার ওপর দুর্দশা। বাতাসের বেগ রাত একটা-দুটোর আগে নাও কমতে পারে। তাহলে তো বাড়ি পৌঁছোতে কাল বেলা একটা-দুটো!

এদিকে বাইরে গাঢ় অন্ধকার! আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের স্ফুরণ। কড় কড় মেঘের গর্জন। বাতাসের অট্টহাসি, গঙ্গার প্রলয় নাচন। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও অবস্থা। তারই মধ্যে দূরে এপারে ওপারে ঘাটের বিজলি আলোর সারি, আশালতার মতো স্থির হয়ে জ্বলছে।

আমার পাশের ভদ্রলোকটি একটি কালো রঙের সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে ধরে প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা ধরান, আরাম পাবেন। ঝুট-মুট ভাবেন কেন?"

সিগারেটে অভ্যস্ত নই, তবু একটা টেনে নিয়ে ধরালাম। সত্যি! সেই শীতে বড়ো আরাম বোধ হতে লাগলো।

ভদ্রলোক ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আজকের রাতখানা ভয়ঙ্করই বটে। আমার কোষ্ঠীতে আছে, আজকের তারিখে রাত্রি বারোটায় গঙ্গাবক্ষে আমার মৃত্যু হবে। সেজন্যে ভাবি না। অনেক পুণ্যে লোকে গঙ্গায় ডুবে মরে। ভাবছি, এইজন্যে যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে ডুববে।'

ভদ্রলোকটির কথা শুনে মনে হলো লোকটির হেড-অফিসে কিছু গোলমাল আছে। নইলে, কী করে বলে, ওর কোষ্ঠীকার অন্যের ভাগ্যফল ওর কোষ্ঠীতে লিখেছে—তাকিয়ে দেখলাম, না; লোকটির দৃষ্টি বেশ সহজ ও সাধারণ, তবে গল্প বলার উত্তেজনায় কিছু উজ্জ্বল। কিন্তু হাতের আঙুলগুলো কেমন শুকনো ও অস্বাভাবিক লম্বা।

ভদ্রলোক আবার বললেন, 'কোষ্ঠীতে আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না মশাই। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে যদি মানুষের ভালোমন্দ হয়, তবে সাপ-ব্যাঙ তো মানুষের মতই প্রাণী। কী বলেন? তাহলে তো এই লন্‌চের সঙ্গে বাঁধা ফ্ল্যাট যাতে আমরা বসে আছি, যা

ঢেউয়ে দুলছে, কুলে ধাক্কা মারছে, মাঝে মাঝে বিশ্রী শব্দ করছে, এটার ওপরেও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব থাকাও তো স্বাভাবিক বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু মশাই, তর্কে যাবো না, ওতে আমার মাথা ঘোরে। কোন্ ঘটনায় কোষ্ঠীতে বিশ্বাস হলো, তাই বলি। চা খাবেন? চায়ের স্টলও তো দেখছি ফাঁকা হয়ে গেছে। যাক। শুনুন। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে, "আঠারো বছর বয়সে রেলের পুল ভেঙে গাড়িসুদ্ধ নদীতে পতন ও মৃত্যু।" তবে কোনো সহযাত্রীর দেহের ওপর পড়লে আঘাত গুরুতর হবে না, রক্ষা পাবার সম্ভাবনা। কারণ শনি রক্ষাকর্তা। আমি ক্যানভাসার। নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে জর্দা-সুর্তির ক্যানভাস করে বেড়াই। তবে নিজে ওসব খাই না। আমার ব্যাগে আছে। যদি চান, এখনই দিতে পারি। অবিশ্যি আপনি যে ওসব খান না, আপনার ঠোঁট আর দাঁত দেখেই বুঝেছি। সিগারেটেও আপনার অভ্যাস নেই। সিগারেট ধরা, ধোঁয়া ছাড়া তার প্রমাণ দিচ্ছে। যাক, সেবার যাচ্ছি গৌহাটি। গাড়িতে অসম্ভব ভিড়। আমার ডান পাশে গৌহাটির এক ব্যবসায়ী, বাঁ পাশে লামডিংয়ের এক মুসলমান কারবারি। দু'জনেই বেশ মোটাসোটা আর গম্ভীর। ওরা গিয়েছিলো কলকাতায় সওদা করতে।

"বর্ষাকাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ি জলপাইগুড়ি থেকে আসামের দিকে ছুটেছে। ও অঞ্চলে গিয়েছেন কখনও? যান নি! তিস্তার নাম শুনেছেন তো? নেমে এসেছে সেই হিমালয় থেকে, ভারি স্রোত। ওপর দিকে বৃষ্টি হলো তো ওর কূল ছাপিয়ে জল ছুটতে লাগলো। ওর ওপর পুল আছে। গাড়ি ছুটতে ছুটতে সেই পুলটার ওপরে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করে ভেঙে গেলো। আর আমাদের নিয়ে গাড়িখানা পড়লো তিস্তার পাথর-ভরা বুকে। এই ঘটনার খবর আপনি খবরের কাগজে পড়েন নি? পড়েছেন! তখন কী বুঝতে পেরেছিলেন, তার এক যাত্রীর সঙ্গে আপনার এক দুর্যোগের রাতে এই গঙ্গার বুকে দেখা হবে? সে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা, আপনাকে কী বলবো? মনে হলো, মরে গেছি এবং মরাটা

ভারি সহজ। দেহ বলতে আমার কিছু নেই। মৃত্যুলোকের অন্ধকারে আমি যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়েও পড়লাম। স্বপ্নহীন ঘুম।

'ঘুম যখন ভাঙলো দেখি আমার পাশে স্টেথিস্কোপ গলায় মোটাসোটা এক ডাক্তার, টুপি মাথায় ট্রে হাতে ঘাগরা পরা এক নার্স, আমার সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা।

"একটু সুস্থ হলে শুনলাম, একটা মোটা লোকের ওপর পড়েছিলাম, তাই বেঁচে গেছি। আমার পাশে দু'জন মোটা লোক ছিলো—একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। সেই গৌহাটি আর লামডিংয়ের দু'জন কারবারি। কী জানি, কে আমায় রক্ষা করেছে। সেদিন থেকে আমার কোষ্ঠীতে বিশ্বাস হয়েছে। আজকের রাতে—আচ্ছা মশাই আপনি সাঁতার জানেন?'

বললাম, 'জানলেই কি এই তুফানে রক্ষা পাবো?'

তিনি বললেন, 'খানিকক্ষণ তো ভেসে থাকতে পারবেন? স্রোতের টানে, ঢেউয়ের ধাক্কায় কূলের কাছে গিয়েও পৌঁছোতে পারেন। আমি সাঁতার শিখিনি মশাই। আজকের ফাঁড়াটা কাটাব সাঁতারুর গলা জড়িয়ে ধরে। আপনার সঙ্গে আলাপটা আমার ভাগ্যই করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আপনার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই। আপনার পাশে পাশেই আমায় থাকতে হবে। লন্চডুবি হলে তুফানভরা গঙ্গায় আপনার গলা দু' হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকা ছাড়া আমার আর উপায় নেই।'

বললাম, 'কিন্তু আমাদের লন্চ তো কূলে বাঁধা।'

তিনি বললেন, 'সবই ভাগ্যের খেলা। কাছি ছিঁড়তে কতোক্ষণ? ঐ শুনুন, কাছি ছেঁড়ার উৎকট আওয়াজ।'

সত্যই খালাসীরা তখন ওপরে নিচে চীৎকার ও ছুটোছুটি করছে। কট্ কট্, কড়্ কড়্ আওয়াজ হচ্ছে।

ঢোঁক গিলে বললাম, 'কিন্তু আমার গলা জড়িয়ে ধরলে আমরা দু'জনেই যে ডুবে মরবো।'

'কক্ষনো না—কোষ্ঠীর বিচার মিথ্যে হবার নয়—'বলে ভদ্রলোক

আর একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, 'আপনি লেখক হরেন দস্তিদারের নাম শুনেছেন? ও কী, ওরকম করে তাকাচ্ছেন কেন?'

লেখক মহলে ও নামের অধিকারী একমাত্র আমিই, যদিও ওটা আমার আসল নাম নয়। বললাম, 'কী বলতে চান?'

'তাঁর বই পড়েছেন? পড়েন নি? অমন গল্প আর কেউ লিখতে পারবে না মশাই।' বলে ভদ্রলোক এমন ভাবে ধোঁয়া ছাড়লেন, যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন।

তাঁকে উত্যক্ত করতে বললাম, 'ছাই লেখে! ওরকম গল্প আমিও—'

'কী! ঐ রকম গল্প? আচ্ছা ও তো মরে গেছে, দেখা যাক, কার কলম দিয়ে ওরকম গায়ে কাঁটা তোলানো গল্প বেরোয়।'

আমি অবাক! আমি বেঁচে নেই? লোকটা বলে কী? তাকে একটা থাপ্পড় দেবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'হরেন দস্তিদার যে আপনার সামনে বসে।'

তিনি হো হো করে এমন হেসে উঠলেন যে, আশপাশের সকলে চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। ঝড় তখনও গঙ্গার জল নিয়ে তেমনি মাতামাতি করছে। পারগামী একখানা স্টীমারের তীব্র সিটি শোনা গেলো। যেন ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হয়ে আর্তনাদ করছে।

ভদ্রলোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, 'হরেন দস্তিদার আর আমি কলকাতার ন্যাড়া গির্জার কাছে ধাঙড় বস্তির পাশে একটা মেসে থাকতাম। সে থাকতো তেতলার চিলে কোঠার পাশের ঘরে, আমি থাকতাম দোতলার পূব-দিকের খুপরি ঘরখানায়। তার ঘরে গিয়ে কতোদিন রাতের বেলা গল্প শুনেছি। লোকটি ভূত-প্রেত, কোষ্ঠী—মানে কিছুই বিশ্বাস করতো না। ওর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, চল্লিশ বছর বয়সে ঊর্ধ্ব থেকে পতন ও মৃত্যু।'

পরিষ্কার বুঝছিলাম, লোকটির মাথার ঠিক নেই। তাই তাঁর প্রলাপ শুনতে ভালো লাগছিলো না। ঘোর দুর্যোগের মধ্যে আমায় একটা পাগলের পাল্লায় পড়তে হবে, আমার কোষ্ঠী না থাকলেও

ভাগ্যে নিশ্চয়ই লেখা ছিল। এঁকে এখন এড়ানো মুশকিল। শোনাই যাক শেষ পর্যন্ত, হরেন দস্তিদারের কী হলো।

ভদ্রলোক বললেন, 'হরেন দস্তিদার আমার কালো সিগারেট আর স্ফূর্তিগুলির ভারি ভক্ত ছিল। এগুলোর সম্বন্ধে সে কী বলতো জানেন? আচ্ছা থাক। বুঝতে পারছি, আপনার কাছে তার কোন দাম নেই। বেশ মনে আছে, সেদিন শনিবার, ঘোর অমাবস্যা, গির্জার ঐ অঞ্চলে সন্ধ্যাতেই হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হয়ে গেলো। দস্তিদারবাবু স্ফূর্তি খেয়ে ছাদের পাঁচিল ধরে পানের পিক ফেলতে গিয়েই হুড়মুড় করে এক শব্দ। তিনি পাঁচিল ভেঙে একেবারে সটান নিচে। তবে সোজাসুজি রাস্তায় নয়, ইলেকট্রিক পোস্টের ঠিক মাথায়। সেখান থেকে গড়িয়ে তারে পড়ে দোল খেতে লাগলো। সে যে কী বীভৎস আর মর্মান্তিক দৃশ্য! হরেন দস্তিদার—'

'এ বাবু—বাবু—'

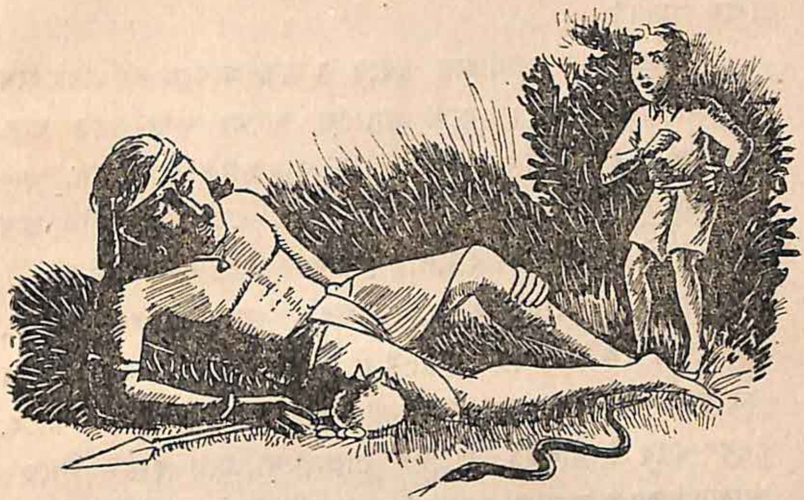
কে যেন আমায় ঠেলছে। অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকালাম। লোকটা বলছে, 'কোথায় যাবেন? জাহাজ ঘাটে ভিড়েছে—যাত্রীরা নেমে গেছে।'

'অ্যাঁ!' আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। সব ফাঁকা, যাত্রীরা কেউ নেই। আমার স্যুটকেশও নেই, পকেটও খালি, চিন্তাশক্তিও দুর্বল। তবে চেতনা ও কর্মশক্তি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে লাগলো; বলার দরকার নেই, ঠগের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ফরাক্কায় আমার বড়োকুটুম ছিলেন। বিপদে তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে উঠলাম। সব শুনে বললেন, 'নেমন্তন্ন করলে তো আসো না। সেই আসতে তো হলো।'

তার বাড়িতে সে দিনটা থাকতেই হলো। আসবার সময় জিগ্যেস করলাম, 'বলো দেখি ভাই, যে লোকটি আমার এই হাল করে তোমার বাড়িতে আসতে বাধ্য করেছে সে তোমারই লোক কী না?'

শুনে বড়ো কুটুমের হাসি আর থামে না।



কোথা দিয়ে কী হতে পারে

মংলু তখন পাঁচ বছরের আহ্লাদে খোকা। একদিন ওদের ঝি ওকে কোলে নিয়ে বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। এক জ্যোতিষী এসে ভিক্ষা চাইলে। সে ওর গাল টিপে আদর করে, হাত দেখে বলে, "রাজা হবে।" এবং ভিক্ষে না নিয়েই চলে যায়।

একটু পরে ঝিয়ের হুঁশ হতে সে মংলুর গলার দিকে তাকিয়ে দেখে, ওর গলার হারগাছটি নেই। অমনি বেচারী ভয়ে কেঁদে ফেলে ; মংলুকে কোলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ভেতরে গিয়ে মংলুর মামীকে বলে, "মাগো! সর্বনাশ হয়েছে।"

মামী তখন বঁটিতে ল্যাংড়া আম কুটছিলেন। বলেন, "কী হলো?"

"আমি বিন্দু-বেসগ্গও জানিনে মা-আ-আ—"

"কী হয়েছে বল্ না—"

"মংলু দাদাবাবুর গলার হার—"

"হারিয়েছো, এই তো? বেশ করেছো। সেদিন অনেক খুঁজে-পেতে কিনে এনে দিলুম। গোল্লায় দিয়ে এলে? এখন খালি

গলায় থাকুক। ওকে এখানে নামিয়ে দিয়ে একটা পান সেজে নিয়ে আয়।"

ঝি চোখের জল আঁচলে মুছতে মুছতে মংলুকে নামিয়ে রেখে পান সাজতে ছোটে। মামী ল্যাংড়া আমের কুচি নিজে খান, মংলুকেও দু-এক কুচি খাওয়ান। ঝি পান হাতে এসে দেখে, অমন যে একগাছা সোনার হার চোরে নিয়ে গেল, সেজন্যে একটুও দুঃখ নেই। ঝি ভাবলো,:কী বড়লোক! রাজার ভাগ্নে রাজা হবে না?"

আসলে হারগাছটি নকল সোনার! আর, মংলুরও বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। মামা-মামী ওকে ছেলের মতো মানুষ করছেন। ওঁদেরও ছেলে-পুলে নেই, তবে পয়সা-কড়ি বেশ আছে, সেসব খাবে ঐ মংলুই। কাজেই রাজা তো মংলু হয়েই আছে। আবার নতুন করে রাজা হবে কী? জ্যোতিষীর বলা উচিৎ ছিল ও রাজার রাজা হবে।

মংলু বড় হচ্ছে। এখন কোলে ওঠে না, চাকরের কাঁধে চড়ে। মাঝে মাঝে মাথায় ওঠবার আবদার ধরে। চাকর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করে। সে ভূত, প্রেত, রাক্ষস-খোক্কোসের গল্প বলে। কোথা থেকে একটা মুখোশ জোগাড় করে এনে প'রে দেখায়, ভূতের চেহারা কেমন। নিজের দুই কড়ে আঙুল দিয়ে ঠোঁট ও মুখকে যথাসম্ভব টেনে, জিভ বার করে দেখায়, রাক্ষসের মুখ কী রকম কদাকার দেখতে। বলে, "ওরা রক্ত-মাংস ছাড়া আর কিছু খেতে চায় না। ছোট ছেলেদের সন্দেশ আর রসগোল্লার মতো টপাটপ্ মুখে পোরে।" এবং একদিন রাক্ষস সেজে মংলুকে খেতে যাবার ভান করবার ফলে তার চাকরিটি যায়! বেচারীর নাম জটেশ্বর।

লোকে বলে, ঘুমন্ত লোকের মাথায় গোখরো বা কেউটে সাপে ফণা ধরলে সে রাজা হয়। এ কথার প্রমাণ না থাক কারো বিশ্বাস করতে আটকায় না। মংলুর মামা-মামীও অবিশ্বাস করতেন না।

একবার তাঁরা গেলেন জামতাড়ায় সাঁওতালি হাওয়া খেতে। মংলুর ভারি আনন্দ। কলকাতার সঙ্গে দেশটা একটুও মেলে না,

গল্পে-শোনা দেশগুলোর সঙ্গেও মিল নেই। সব ফাঁকা ফাঁকা, একদম অচেনা। মংলু একদিন দুপুরে ঘুমোচ্ছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। মামীও ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখেন, জানলার বাইরে একটা সাপ ফণা ধরে দুল্‌ছে, যেন গরাদ গলিয়ে মংলুর গালে চুমো বা ছোবল দিতে চায়। তার দোদুল ছায়া এসে পড়ছে ঘুমন্ত মংলুর মুখে। দেখেই মামী "সাপ—সাপ" বলে চীৎকার করে ওঠেন। তাতে কিন্তু মংলুর ঘুম ভাঙে না। মামা ও চাকর-বাকর ছুটে এসে জানলার দিকে তাকিয়ে একেবারে থ।

সাঁওতালি চাকরটা এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সাপের মাথাটা পট্‌ করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে দেখায় সবাই দেখেন, সেটি একটি আকন্দ পাতা! তবু মামীর বিশ্বাস হয় না। তিনি যে স্পষ্ট দেখলেন, সাপ। মংলু রাজা হবেই।

তারপর দিন যায়, মংলু বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু লেখাপড়ায় তার মন বসে না। সে যে রাজা হবে! তার মামী একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। তার মামার বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি ও সবকিছু দিনে দিনে কর্পূরের মতো কোথায় উড়ে গেল। তিনিও বাঁচলেন না। মংলুর বয়স তখন ঠিক বারো বছর। সে খুব কাঁদলো। কোথায় যাবে, কী খাবে, কী করবে, বুঝতে পারে না। পাড়ার একদিকে খান-দুই ছোট ছোট ঘর মামা একজনকে ভাড়া দিয়েছিলেন। ঘর দুখানা মামা বেচতে ভুলে গিয়েছিলেন। পাড়ার মাতব্বরেরা এসে বলেন, "মংলু, তুই ঘর দুখানার একখানাতে থাক গে, বাকিখানা ভাড়া দে। ওতেই চলে যাবে।"

কিন্তু ভাড়াটে বলে, "উঠবো না। এ বাড়ি আমার।" মাতব্বরেরা বলেন, উঠবো না মানে? "যা বলি শোন। নইলে মেরে পস্তা উড়িয়ে দেবো। জানো, কোথায় এসেছো? এর নাম ঠ্যাঙাড়ে পাড়া।"

সে বলে, "যান্‌ যান্‌, সর্দারি করতে হবে না। ঢের ঠ্যাঙাড়ে দেখেছি।" তারও দল ছিল।

"তবে রে।" বলে সবচেয়ে বুড়ো মাতব্বর খড়ম হাতে তেড়ে যান।

শেষে মিটমাট হয়ে যায়। ভাড়াটে একখানা ঘরে উঠে আসে। বাকিখানায় গিয়ে ওঠে মংলু। ভাড়াটের ঘরেই সে খায়-দায়, শুয়ে থাকে পাশের ঘরে। মামা-মামী থাকতে সে ইস্কুলে যেত, এখন ইস্কুলের রাস্তাই গেল ভুলে!

তার মামার এক বন্ধুর ছিল মস্ত একটা পুকুর। তাতে ছিল বড় বড় মাছ। মংলু মামার সঙ্গে সেখানে কয়েকবার মাছ ধরতে গিয়েছিল। পুকুরের মালিকেরও একটি ছেলে ছিল মংলুর বয়সী। ছেলেটার বুদ্ধি ছিল খুব। নাম ছিল ঝানটু। মংলুকে সে পছন্দ করতো না।

সেবার বর্ষার জলে পুকুরটা ভরে উঠলে মংলুর শখ হলো, ঐ পুকুরে মাছ ধরবে। মামার ছিপ-হুইল তখনও ছিল। মংলু মালিকের অনুমতি নিয়ে টোপ-চার জোগাড় করে এক রবিবারে গেল মাছ ধরতে। জলে চার ফেলে, বঁড়সীতে টোপ গেঁথে, ছিপ ফেলে সে বসতে যাবে এমন সময় তার পাশে ঘাসের জঙ্গল থেকে ফোঁস করে ফণা ধরে উঠলো একটা সাপ। মংলু প্রাণভয়ে সব ফেলে দে ছুট। তার মাছধরা হলো না।

তাকে ছুটে পালাতে দেখে ঝানটুর কী হাসি! সাপটা আসল নয়, স্প্রীংয়ের। ঘাসের মধ্যে সে লুকিয়ে রেখেছিল।

মংলুর মামার আর এক বন্ধুর ছিল একজোড়া অ্যালসেশিয়ান কুকুর। মংলু মামার সঙ্গে তাদের বাড়িতেও যেত। কুকুর দুটোর বাচ্চা হতে মংলুর শখ হলো কুকুর পুষবে। একদিন গেল বাচ্চা চাইতে। ফটকে ঢুকতেই একটা কুকুর ছুটে এসে তাকে ভালুকের মতো দু পায়ে ধরে মুখের সামনে মুখ এনে মস্ত জিভ বার করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। মংলু ভয়ে চীৎকার করে উঠেই প্রায় অজ্ঞান। বাড়ির কর্তা তাড়াতাড়ি এসে কুকুরটাকে বলেন, "ছেড়ে দে। বন্ধু।"

কুকুরটা মংলুকে ছেড়ে দেয়।

মংলু সেই যে চলে আসে তারপর আর সে বাড়িমুখো হয়নি, কুকুর পোষার শখও তার মন থেকে চলে গেছে।

মংলু যত বড় হয় ততই ভাবতে শেখে। একদিন সে ভাড়াটেকে বলে, "বিদেশে চললাম। আমার ঘরখানার দিকে নজর রেখো।"

কিন্তু সে যে কোথায় যাবে কিছুই জানে না। দেখছে, যা করতে যায় তাতেই বাধা পায়।

তবু মংলু চলেছে। তার ট্যাঁকে গোটা কয়েক টাকা, হাতে লাঠি, পোঁটলায় চিঁড়ে-গুড়।

প্রথমে রেলগাড়ি, তারপর মোটর-বাস, শেষে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়ে দক্ষিণের একটা গঞ্জে। জায়গাটা সে চেনে না, দিকটাও ঠিক করতে পারে না, মানুষগুলো সব নতুন, কথাবার্তার টানও যেন কেমন। একবার মনে করে ওড়িয়া, আবার মনে করে, বাংলা, কখন ভাবে সাঁওতাল—। যে ভাষাই হোক, বোঝা গেলেই হলো। তাই ভাষা নিয়ে মাথা ঘামায় না। গঞ্জে চিঁড়ে-দই-গুড় খেয়ে, আরও চিঁড়ে গুড় কিনে, পোঁটলাটা লাঠির আগায় বেঁধে ঘাড়ে নিয়ে পরদিন ভোরে রওনা হয়।

চলতে চলতে খানিক বেলা উঠলে এসে পড়ে এক জঙ্গলের ধারে। জায়গাটা ভারি নির্জন, এত নির্জন যে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। মনে হয় সব ঘুমোচ্ছে। এখন দিন নয়, নিশুতি রাত। অথচ রোদে গা-মাথা পুড়ে যাচ্ছে, দর্ দর্ করে ঘাম ঝরছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে 'তিরপুর্ণির মাঠ।'

সে এদিক-ওদিক তাকায়, কোথাও জল চোখে পড়ে না। মনে করে, জঙ্গলের মধ্যে দু-একটা পুকুর থাকতেও পারে। ঢোকে জঙ্গলে। কিন্তু খানিকটা গিয়েই পথ হারিয়ে ফেলে। আর বেরোতে পারে না। একটা গাছতলায় বসে কাঁদে।

হঠাৎ তার কানে আসে অনেক লোকের চীৎকার আর কুকুরের ডাক। মস্ত একটা বুনো শুয়োর তার সামনে দিয়ে তীরবেগে ছুটে

চলে যায় একদিকে। শুয়োরটার মুখে একজোড়া ধারালো সাদা দাঁত। ভাগ্যে সে মংলুকে দেখেনি। শুয়োর পালাতেই মংলুর সামনে এসে পড়ে গোটা চারেক বাঘের মতো কুকুর। কিন্তু তারা মংলুর দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না, শুয়োরটার পিছু নেয়। তাদের পরই বল্লম, তীর-ধনুক, আগা চোখা লম্বা বাঁশ ও দড়ি হাতে ছুটে আসে একদল বুনো।

এমন সময়ে কুকুরগুলোর তাড়া খেয়ে শুয়োরটা আবার ঘুরে আসে। অমনি বল্লম ও বাঁশের খোঁচায় বিঁধে যায়। তখন বুনোদের কী উল্লাস! কুকুরগুলোও আনন্দে লেজ নাড়ে। এমন সময়ে, একজনের নজর পড়ে মংলুর দিকে। সে বলে, "তুই কে রে? এখানে কী করছিস্ রে বাবা?"

মংলু বলে, "জলের খোঁজে বনে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

সে বলে, "এখনই চলে যা। নইলে মরবি। ইদিকে সোজা চলে যা।"

মংলু তৎক্ষণাৎ উঠে চলতে থাকে। খানিক পরে বনের বাইরে একটা নতুন পথে এসে পড়ে। বেলা তখন দুপুর। সামনে ছিল একটা বটগাছ। সেখানে একটা লোক বসেছিল। মংলু তাকে বলে, 'জল'। লোকটা বলে, 'হুই নারকোল গাছে ঘেরা দীঘি।'

মংলু লোকটার নির্দেশমতো সেখানে গিয়ে দেখে, সত্যি সেখানে একটা দীঘি রয়েছে। কাকচক্ষুর মতো পরিষ্কার তার জল। সে প্রাণভরে জল খেয়ে নারকোল গাছের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করে আবার চলে।

তারপর যখন সন্ধ্যা লাগে লাগে এসে পড়ে ছোট্ট একখানা গাঁয়ের কাছে। তখন সেখান দিয়ে জনকয়েক ডাকাত যাচ্ছিল। ডাকাত-সর্দার তাকে বলে, "কোথা যাবি রে?"

মংলু বলে, "ঐ গাঁয়ে।"

"ওখানে তোর কে আছে?"

"কেউ নেই।"

"মিছে কথা বলছিস্! ঠিক করে বল্! তোর বাড়ি কোথা?"

মংলু লোকটার চেহারা দেখে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, "আমার বাপ-মা নেই। আমি গরিবের ছেলে। পথে পথে ঘুরে বেড়াই।"

ডাকাতদের সর্দার মংলুকে বলে, "চল্ আমার সঙ্গে।" আর সঙ্গীদের বলে, "তোরা রাত তিন পহরে ছাটিমতলায় থাকিস্। একেই আজ বলি দেব।"

শুনে মংলু থর্ থর্ করে কাঁপে।

সাথীরা চুপচাপ চলে যায়, সর্দার মংলুকে নিয়ে একটা মাঠের পথ ধরে, খানিকদূর গিয়ে মংলুকে বলে, "তোর কাছে কী আছে, দে।"

মংলু ভয়ে ভয়ে ট্যাঁক থেকে চারিটি টাকা বের করে চিঁড়ের পোঁটলাটার সঙ্গে তার হাতে দেয়।

লোকটা বলে, "আর কী আছে?" এবং মংলুর শরীর তল্লাস করতে গিয়েই হঠাৎ "ওরে বাবারে! সাপে কামড়ালো রে!" বলেই এক লাফে সরে যায়। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারে না, ঢলে পড়ে। আর বলে, "জ্বলে গেল! ওঃ! জ্বলে গেল! আমায় বাঁচা।"

মংলু ভয়ে কাঠ। পালাতেও পারে না। থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। তাকেও যদি সাপটা কামড়ায়! সাপটা কিন্তু লোকটাকে কামড়েই সরে পড়ে।

লোকটা বলে, "ওরে, আমার এখানটা গামছা দিয়ে বাঁধ।"

মংলু বাঁধে।

লোকটা আবার বলে, "এখান থেকে দক্ষিণে দীঘির পাড়ে আমার ঘর—উত্তর কোণে অশ্বত্থতলায় পোঁতা—" বলতে বলতেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়। মংলু এবার কেঁদে ফেলে। এই মাঠে একটা মরার পাশে দাঁড়িয়ে তার গা কাঁপতে থাকে। কোথায় সে যাবে? কোন দিক বা দক্ষিণ কিছুই ঠিক করতে পারে না। এদিকে আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় সে এদিক-ওদিক্ তাকাতে তাকাতে দেখে, গান গাইতে গাইতে একটা লোক আসছে। লোকটা মংলুর কাছে এসেই বলে, "কে রে? ওখানে পড়ে কে? আরে এ যে—কী হয়েছে?"

মংলু বলে "সাপে কামড়েছে।"

"সাপে কামড়েছে? মরেছে নাকি? তাই তো রে? এ যে দেখছি সোনা, ডাকাতের সর্দার। তুই এর কে—আরে, দাদাবাবু যে? তুমি এখানে এই বেশে?" মংলু চিনতে পারে লোকটাকে। ও হচ্ছে সেই জটেশ্বর চাকর যাকে মংলুর সাথী বরখাস্ত করেছিল, মংলুকে ভয় দেখিয়েছিল বলে। মংলুর এখন মনে সাহস হয়। সে লোকটাকে তার দুর্দশার কাহিনী জানাতে সে বলে, "চলো—চলো শিগ্‌গির এখান থেকে চলো। নইলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে।"

সে মংলুকে নিয়ে অনেক রাতে এসে পৌঁছোয় তার বাড়ি। মংলু পথে যেতে যেতে ডাকাতটার সব কথা বলে। শুনে জটেশ্বর চুপ করে থাকে। তার বুড়ি পিসি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না। সে খেত-মজুরের কাজ করে আর বুড়ি লোকের বাড়ি ধান ভানে, গরুর জাবনা কাটে, কাঁথা সেলাই করে। তাতে দুজনের বেশ চলে যায়। বুড়ি মংলুকে পেয়ে ভারি খুশি। সেদিন থেকে মংলু সেখানে খায়-দায় থাকে।

জটেশ্বর একদিন বলে, "ডাকাত-বেটার গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। মেলা গহনা-গাটি আর টাকা-কড়ি দুটো দশ-সেরা মাটির হাঁড়িতে পোঁতা আছে।"

শুনে মংলু অবাক হয়।

জটেশ্বর আবার বলে, "ও-সব সে যখন তোমায় দিয়ে গেছে তখন তোমার। তুমি রাজা হয়ে গেছ। কিন্তু একটা কথা—"

মংলু জিগ্যেস করে, "কী?"

"সোনা-রূপো তো পেলে। এখন ও সব ভাঙাবে কি করে? লোকের সন্দেহ হবে যে। তা ছাড়া সোনা বেটার দোসর তো খুঁজছে ওর ধন-দৌলত কোথায় পোঁতা আছে। যদি টের পায় তুমি নিয়েছো তা হলে তোমায় একদিন কেটে ফেলবে।"

মংলু বলে, "তা হলে কী হবে? ও-সব পাওয়া যাবে না?"

"যেতে পারে। তুমি যদি দুটো হাঁড়ির একটা আমায় দাও।"

"বেশ। কোন্‌টা নেবে?"

"সোনা ভরা হাঁড়িটা।"

"তাই হোক। এখন রূপো ভরাটা আমায় এনে দাও।"

জটেশ্বর বলে, "তা যেন দিলাম। কিন্তু নিয়ে যাবে কি করে?"

মংলু ভাবনায় পড়ে।

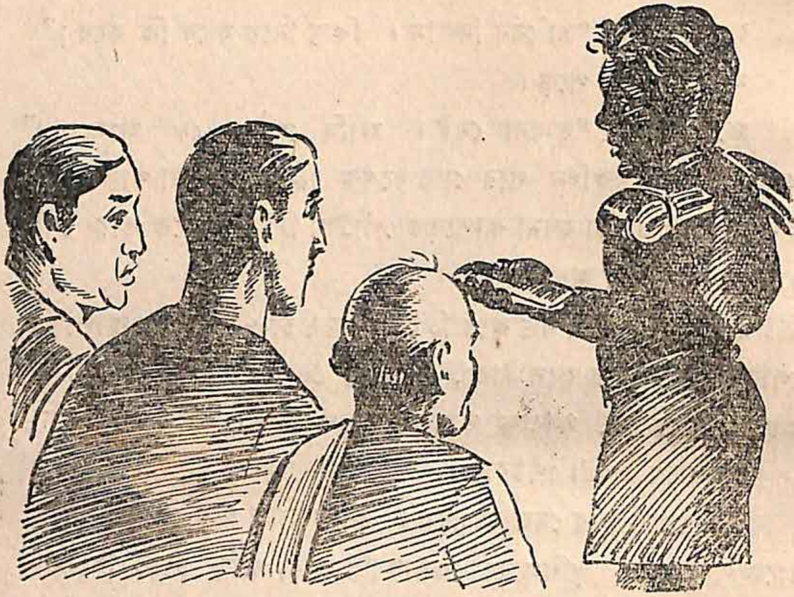
জটেশ্বর বলে, "ভাবনা নেই। আমি পৌঁছে দে আসবো।" এবং তার কয়েকদিন পরে সের দশেক চিঁড়ে, একটা পাকা চাল-কুমড়ো আর একটা জামা কাপড়ের পোঁটলা নিয়ে মংলুকে তার সেই ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে।

মংলু রাতে দরজা বন্ধ করে চিঁড়ের বস্তা, চাল-কুমড়ো ও কাপড়ের পোঁটলা থেকে বার করে টাকা, আধুলি, নোট। কিন্তু গুণে ঠিক করতে পারে না, সবসুদ্ধ তার পরিমাণ কত। টাকাকড়িগুলো সে পুরে রাখে একটা পেঁটরায়।

টাকা পেয়ে তার মেজাজ গরম। ভাবে রাজা হয়ে গেছে। আর তাকে পায় কে? খুশিমতো কেনাকাটা করে, গাড়ি চড়ে, সিনেমা দেখে। লোকে ভাবে, তার অবস্থা হঠাৎ ফিরে গেল কী করে? কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না। মংলুও বুঝতে দেয় না। সে হঠাৎ খুব চালাক হয়ে উঠেছে; বোঝেও বেশি। যাকে-তাকে ধমক দেয়। এমনি অবস্থায় একদিন ভোরে উঠে দেখে, তার ঘরের জানালা ভাঙা, দরজা খোলা, পেঁটরা নেই! মংলুর চোখ ফেটে জল আসে। একবার ভাবে, পুলিশে খবর দেবে। পরক্ষণেই মনে হয়, তা হলে সে কোথা থেকে টাকাগুলো পেয়েছে পুলিশের কাছে বলতে হবে। অমনি পুলিশ তাকে ডাকাতের দোসর বলে গ্রেফতার করবে। তাই টাকার শোক গিলে আগের মতো থাকবার চেষ্টা করতে থাকে। তার রাজা হওয়া হয় না।

ওদিকে জটেশ্বরের সোনার হাঁড়িও একদিন ডাকাতে লুটে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে এমন মার খায় যে, তিনমাস হাসপাতালে থাকতে হয়। সেও রাজা হতে হতে খেত-মজুরই রয়ে যায়।

এইভাবে ডাকাতির ধন নেয় চোর-ডাকাতে। কারো উপকারে লাগে না।



একটি নীতি বটিকা

গোপালবাবু ট্রাম থেকে নেমে ফুটপাতে উঠে কয়েক পা যেতেই নীলকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। নীলকৃষ্ণবাবু জিগ্যেস করলেন, "কী গোপাল, খালি পা যে? কে মারা গেছেন?"

গোপালবাবু বললেন, "আমিই মারা গেছি।"

নীলকৃষ্ণবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে গোপালবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মনে মনে বললেন, "ব্যাপারটা কি বল তো?"

"ব্যাপার আর কী? সবে গতকাল সাড়ে বারো টাকা দিয়ে জুতো জোড়া কিনেছিলাম—"

নীলকৃষ্ণবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "নেমন্তন্ন বাড়িতে এ কাণ্ড তো হামেশাই হয়। যা দিনকাল! ছেঁড়া চপ্পলে পা গলিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাওয়া উচিত। তা কার বাড়িতে গেল? শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন ছিল বুঝি? কার শ্রাদ্ধ?"

"আমার।"

"রাগ করো না ভাই। দুপুরবেলা নেমন্তন্ন খেয়ে আসছো তাই কথাটা—"

"কী করে বুঝলে যে শ্রাদ্ধের নেমতন্ন খেতে গিয়ে আমার জুতো চুরি গেছে?"

"দুপুর বেলা নেমন্তন্ন খেয়ে আস্‌ছো, খালি পা—"

"নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি বুঝলে কি করে?"

"তবে জুতো হারালো কোথায়? নেমন্তন্ন বাড়ি ছাড়া অমন জুতো চুরির জায়গাই বা কোথায়?"

"ট্রামগাড়ি—বুঝলে, ট্রামগাড়ি—"

নীলকৃষ্ণবাবু যেন খুশী হলেন। বললেন, "তাহলে ট্রামগাড়িতে জুতোও চুরি যায়? পিক-পকেটে পা থেকে খুলে নিয়েছিল, না ভিড়ের চাপে চেপটে গিয়ে—?

"দুটোর একটাও না।"

"তবে?"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে দেখি, জুতো নেই।"

"অসম্ভব।"

"একেবারে খাঁটি সত্য। তার প্রমাণ আমার খালি পা দু'খানা। দেখলে তো যে ট্রামখানা একটু আগে তোমার চোখের সামনে দিয়ে হুড় হুড় করে চলে গেল, ওর সেকেণ্ড ক্লাস একদম ফাঁকা?"

"তা হবে।"

"কাল রাতে গরম আর মশায় ঘুমুতে পারিনি। তাই ট্রামে উঠে পা দু'খানা সামনের খালি বেঞ্চিতে রেখে চোখের পাতা দু'খানি মাত্র মিনিট দুই বুজে আবার যেমন খোলা অমনি দেখি জুতো নেই! এই আক্রা-গণ্ডার দিনে!" বলে গোপালবাবু করুণ চোখে নীলকৃষ্ণ বাবুর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আবার বললেন, "এখনও কত জায়গায় ঘুরতে হবে। সঙ্গে তেমন টাকাও নেই যে নিদেন এক-জোড়া চপ্পলও কিনে প'রে কাজকর্ম সারি।"

নীলকৃষ্ণবাবু বললেন, আমার ব্যাগে যা ছিল তা থেকে

তোমায় সাহায্য করতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তারও উপায় নেই।"

গোপালবাবু নির্লজ্জের মতো জিগ্যেস করলেন, "বাড়ির জন্যে কিছু কিনে নিয়ে যাবে বুঝি?"

"যেতাম বটে, কিন্তু আর নেওয়া হবে না।"

গোপালবাবু জানতেন, নীলকৃষ্ণবাবু কিছু কিপ্‌টে। সেজন্যে জুতোর ফিতে কেনেন না। বলেন, বাজে খরচ। কারো বাড়ি খান না। কারণ পাল্টা খাওয়াতে হবে। দেখলেন, তাঁর পাঞ্জাবির বুকের একটি বোতামও নেই। নতুন জুতো চুরির দুঃখ সত্ত্বেও তিনি মনে মনে একটু কৌতুক বোধ করলেন। পাঞ্জাবিতে কয়েকটা ঝিনুকের বোতামও বাজে খরচ!

কিন্তু নীলকৃষ্ণবাবু হঠাৎ বললেন, "আমায় গণ্ডা তিনেক পয়সা ধার দিতে পারো?"

গোপালবাবু বুঝলেন, বন্ধুটির খুবই অধঃপতন ঘটেছে। নইলে তাঁর দুঃখের সময়েও পয়সা ধার চান? বললেন, "কেন?"

নীলকৃষ্ণবাবু বললেন, "এখান থেকে বাড়ি অবধি বাসের ভাড়া। আজ আর কোন কাজই হবে না।"

"সে কী! এতোদূর এসেছিলে, সঙ্গে বাসভাড়া নেই?"

"ছিল—সবই ছিল, ভাই। চুরি গেছে—বুকের সোনার বোতাম-গুলো সমেত।" বলতে বলতে নীলকৃষ্ণবাবুর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

গোপালবাবু বললেন, "কি রকম?"

"বাসের ভিড়ে সোনার চেন সমেত বোতামগুলো আর ভেতরের এই বুক পকেটের—"

"বলো কী! এও কী কখন হয়?"

"না হলে এগুলো গেল কোথায়? এর চেয়েও বড় প্রমাণ চাও?"

কথা বলতে বলতে দু'জনে এগোচ্ছিলেন। নীলকৃষ্ণবাবুর কথা শুনে গোপালবাবুর দুঃখের ভার একটু হাল্‌কা হলো।

বেলা তখন দুটো বাজে। পথ জনবিরল। বাসগুলোতেই যা-কিছু ভিড়। তবে মাঝে মাঝে দু-একখানা বাস বা ট্রাম গাড়িতে যাত্রী ঠাসা।

কিছু দূরে একটি ছোট পার্ক। মাঝখানে একটি ঝাঁকড়া বকুল গাছ। তলায় গোল করে বেঞ্চি পাতা। পার্কের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ, "চোর চোর" চীৎকারে দুই বন্ধু সেদিকে ফিরে দেখেন—একটি ভদ্রলোক বেঞ্চির কাছে দাঁড়িয়ে ঐ বলে চীৎকার করছেন। পার্কে জনমানব নেই।

গোপালবাবু ভদ্রলোককে লক্ষ্য করতে করতে বলে উঠলেন, "আমাদের শৈলপতি নয়। হাঁ—হাঁ সেই তো। চল-চল, গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে।"

নীলকৃষ্ণবাবু প্রথমটা চিনতে পারেন নি। কারণ শৈলপতি চোখে মোটা কাচের চশমা পরে। এ লোকটির চোখে চশমা দেখা যাচ্ছে না, তবে কণ্ঠস্বর শৈলপতির মতোই বটে। বছর কয়েক আগেও মাঠে খেলা দেখতে দেখতে ঐ রকম মোটা গলায়, 'গোল গোল' বলে ও আনন্দে চীৎকার করতো। অবিশ্যি এই চীৎকার আনন্দ-নিনাদ নয়—আর্তনাদ। তারপর বললেন, "শৈলপতি শহরের এই অঞ্চলে কোথায় যেন উঠে এসেছে। চল, দেখাই যাক্ ব্যাপার কী?" এবং দু'জনে যখন শৈলপতির কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপার কী শৈল?'

তখন শৈলপতিবাবু বেশ রাগের সঙ্গেই উত্তর দিলেন, 'আবার ইয়ারকি হচ্ছে?'

গোপালবাবু ও নীলকৃষ্ণবাবু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। দু'জনেরই মনে এক প্রশ্ন জাগলো, 'শৈল কী শেষে পাগল হয়ে গেছে?' একথা তাদের মনে করবার কারণও ছিল। শৈলপতি-বাবু কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির! যা করেন তাতে সমস্ত মন ঢেলে দেন। চীৎকার করতে হলে, সমস্ত মন প্রাণ ও শরীর দিয়ে চীৎকার করতে থাকেন। না থামালে থামেন না। খেতে বসলে অনবরত

খেয়ে যান! শেষে তলা থেকে আসন ধরে টানতে হয়। ঘুমুতে আরম্ভ করলে অন্ততঃ সাড়ে এগারো ঘণ্টা বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে থাকেন, বলেন, "চোখের বিশ্রাম দরকার।" এমনি আরও অনেক রকমের অসাধারণত্ব দেখিয়ে ভাবুকতা প্রকাশ করেন। অতিরিক্ত চিন্তায় মানুষ কখন কখন পাগল হয়ে যায়। চিন্তার ফলেই কী ওর এমন অবস্থা? নীলকৃষ্ণবাবু একটু ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলেন, "শৈল, আমায় চিনতে পারছো?"

"কে, কে তুমি?" বলে শৈলপতিবাবু তাঁর মুখের দিকে ঝুঁকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন গাঢ় অন্ধকারে সামনের মানুষটিকে অতিকষ্টে চেনবার চেষ্টা করছেন।

"আমি নীলু—নীলকৃষ্ণ—"

"আর আমি গোপাল—" বলে গোপালবাবু শৈলপতিবাবুর একেবারে মুখের সামনে সরে এলেন।

শৈলপতিবাবু বলে উঠলেন, "ও! তোমরা? শয়তান!"

গোপালবাবু একটু অপমানিত বোধ করলেন। তবুও সংযত কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, "কে? কে শয়তান হে?"

"ঐ—ঐ ছোকরা দুটো যারা আমার চশমা নিয়ে সট্‌কেছে। তাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছ?"

নীলকৃষ্ণবাবু বললেন, "কেউ তো এখানে নেই। কী হয়েছে বলতো? তুমিও কী ট্রামে না বাসে চড়ে আসছিলে?"

শৈলপতিবাবু বললেন, "না, না, না, ট্রামে-বাসে চশমা চুরি যায় না। চশমা থাকে চোখে, চোখ থেকে যে চশমা নেয় সে চুরি করে না ডাকাতি করে। যেমন বুক থেকে সোনার বোতাম চুরি করা সম্ভব নয় তেমনি চোখ থেকে চশমা চুরিও অসম্ভব। চুরি কথাটার মধ্যে গোপনীয়তার ভাব আছে।"

নীলকৃষ্ণবাবু বলতে পারলেন না যে তাঁর বুক থেকেই চার চারটে গোল মাথা সোনার বোতাম ও শিকলি একটু আগেই চোরে চুরি করে নিয়েছে।

শৈলপতিবাবু বক্তৃতা করতেও ভালবাসেন। বলে যেতে লাগলেন, "দুপুরে আমি ঘুমুই না, চার ধারের দৃশ্য দেখি। তাই খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে এসে বেঞ্চিতে বসি। আজিও বসেছিলাম, খানিক পরে দুটো ছোকরা কোথা থেকে এসে আমার পাশে বসলো। বসেই আমার চশমা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো। কী নির্লজ্জতা। কী অসৌজন্য! একজন বললে, 'ভদ্রলোক ম্যাগনেফাইং গ্লাস চোখে দিয়েছে।' অপরজন বললে, 'আচ্ছা ভাই, ওতে চোখ পুড়ে যায় না? রোদে ম্যাগনেফাইং গ্লাস ধরে কাগজ পোড়ানো যায়। এতেও তো রোদ পড়ে'।

প্রথম জন বললে, 'ভদ্রলোককে জিগ্যেস কর।' দ্বিতীয় জন বললে 'তুই জিগ্যেস কর'। প্রথম জন বললে, 'তুই কর্।

দ্বিতীয় জন বললে, "আমি একখানা ম্যাগনেফাইং গ্লাস কিনবো।" ঠিক এই সময় একটিপ নস্যি নিলাম। তখন জোরে হাওয়া বইছিল। তাতে নস্যির গুঁড়ো উড়ে আমার বাঁ চোখে লাগলো। চোখটা জ্বালা করে উঠলো। চশমা খুলে পাশে রেখে চোখ মুছে আবার চশমা পরতে গিয়ে দেখি—চশমা বা সেই ছেলে দুটো কেউ কোথাও নেই। তখনই উঠে 'চোর চোর' বলে চীৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু কেউই সাহায্য করতে এলো না।"

নীলকৃষ্ণবাবু তাঁর কথায় একটু ব্যথিত হলেন। বললেন, "আমরা তো এসেছি।"

"আহা হা! তোমরা তো বন্ধু! আসবেই। 'কেউ'-এর মধ্যে পড়না। বলছি কেউ, কেউ, কেউ। তা তোমরা এ সময়ে এদিকে কেন নীলকৃষ্ণ?" বলে শৈলপতিবাবু দৃষ্টিহীন চোখে গোপালবাবুর দিকে তাকালেন।

নীলকৃষ্ণবাবু বললেন, "এসেছিলাম বেয়াইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। পথে যে বিপদে পড়েছি!"—

"বিপদ? কিসের বিপদ গোপাল?" বলে শৈলবাবু নীলকৃষ্ণবাবুর দিকে তাকালেন। গোপালবাবুই উত্তর দিলেন। বললেন,

"ওর বুক থেকে সোনার শিকলি-বাঁধা সোনার বোতাম, পকেট থেকে টাকা আর আমার পায়ের তলা থেকে নতুন জুতো পিক-পকেট হয়ে গেছে!"

শৈলপতিবাবু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বললেন, "অদৃশ্য হাতের কৌশলে আমরা তিন বন্ধু আবার আজ এক হলাম! জীবন কী রহস্যময়। আচ্ছা, তাহলে চল আমার বাড়ি। এখান থেকে বেরিয়ে ডানদিকের গলিতে বাহাত্তুরের একের একের এ নম্বরের দোতালা বাড়ি। সামনে একটু রোয়াক। বেশি হাঁটতে হবে না। লাঠিখানা আজ আনতে ভুলে গেছি।"

নীলকৃষ্ণবাবু ও গোপালবাবু একটু রসিকতা করে সমস্বরে বললেন, "আমরাই দু'জনে দু'দিক থেকে তোমার লাঠির কাজ করব। আমাদের কাঁধে হাত দাও। সেই ছেলেবেলায় তিনজনে যেমন গলা ধরাধরি করে ইস্কুলে যেতাম—তেমন করে চলা যাক্।"

শৈলপতিবাবু অবিশ্যি ততটা ছেলেমানুষী করলেন না। 'তোমার হাতখানা দাও নীলু' বলে গোপালবাবুর হাত ধরলেন।

সত্যিই বেশি হাঁটতে হলো না। গলিতে হাত কুড়িক গিয়েই শৈলপতিবাবুর নতুন রং করা বাড়ি। শৈলপতিবাবুর অবস্থা ভালই।

তিনজন বাড়ির দরজায় পোঁছতেই ভেতর থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠলো—ঘেউ। শৈলপতিবাবু বললেন, "এস, তিনজনে রকে বসে ভাবা যাক্, এখন কর্তব্য কী।" এবং আন্দাজে রকটা চিনে নিয়ে তাতে বসে পড়লেন।

নীলকৃষ্ণবাবু ও গোপালবাবু তাঁর দু'পাশে বসলেন এবং তিনজনেই ভাবতে লাগলেন। বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। গলির মাঝখানে থেকে রোদটা বাড়ির দেওয়ালে উঠে বালুকণায় পড়ে চিক্ চিক্ করতে লাগলো। কলে জল এলো।

হঠাৎ গোপালবাবু বললেন, "ভাই, শৈল এখনই আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। তাতে আমার খুবই ক্ষতি হবে। তবে যদি কোথাও তিনটি টাকা ধার

পেতাম তাহলে অবিশ্যি ঝঞ্ঝাট একরকম মিটে যেত। তাই দিয়ে একজোড়া যেমন তেমন গোছের একজোড়া চপ্পল কিনে পায়ে প'রে বাকি কাজ করতাম। কিন্তু এ অঞ্চলে তুমি ছাড়া আর কার কাছে টাকা ধার—"

অমনি শৈলপতিবাবু বাড়ির দরজার দিকে একটু ঝুঁকে হাঁকলেন, "সুবো—ও-ও-ধ, আমার দু নম্বর চশমা আর হিতসাধনী খাতাখানি নিয়ে এস।"

তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এলো ময়লা খাকি হাফ-প্যাণ্ট-পরা মসীবর্ণ নাদুশ-নুদুশ একটি দশ বারো বছরের ছেলে। তার এক হাতে চশমার খাপ, কাঁধে খেরো বাঁধানো একখানা মোটা খাতা। এসেই জিনিস দুটি শৈলপতিবাবুর পাশে রেখে আবার বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীলকৃষ্ণবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "তাহলে তোমার পয়লা নম্বরের চশমা জোড়া—"

—"না তেসরা নম্বরের। পয়লা নম্বর যখন তখন বার করি না।" বলে শৈলপতিবাবু খাপ থেকে স্টীলের ফ্রেমে বাঁধা একজোড়া চশমা বার করে চোখে লাগিয়ে সুতোর ফাঁস দুটোর একটা কানে আটকে অপরটা অপর কানে জড়িয়ে বেঁধে খাতাখানার পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন।

দুই বন্ধু দেখলেন, প্রত্যেক খালি পাতায় ডেয়ো পিঁপড়ের গাঁদির মতো গদ্য-পদ্য গিজ গিজ করছে।

দু'জনে বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এ সবই কী তুমি লিখেছো? এগুলো কী?"

"নীতিবাক্য। আমারই লেখা—গভীর চিন্তার ফল।"

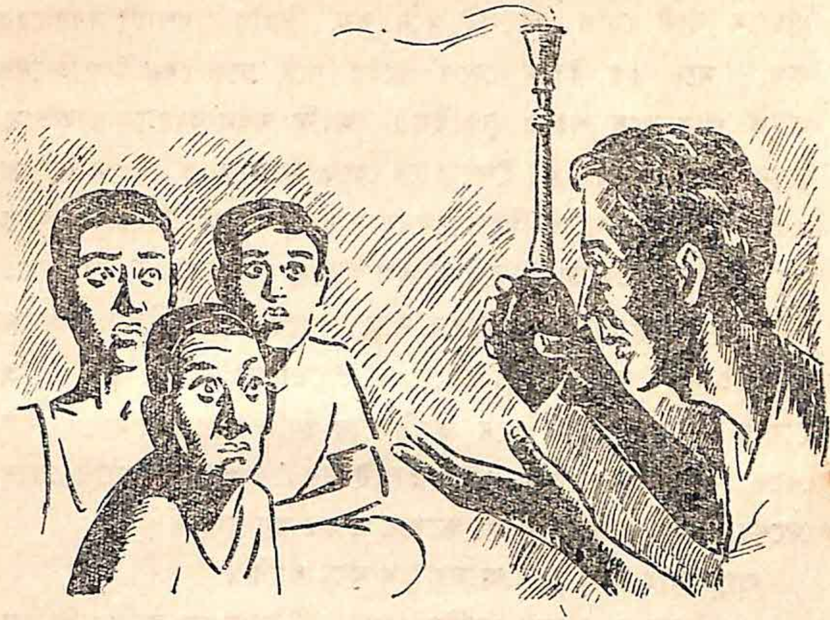
গোপালবাবু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, "আমাদের পক্ষে লেখা তো কোন্ ছার! একটা মনে করতেই মাথা ব্যথা। সেই ব্যথা সারাতে খেতে হয় দু' দুটো অ্যাসপিরিন। বাঃ! বেশ, বেশ। ভাই, আমায় যদি তিনটে টাকা—"

"আর আমায় গণ্ডা চারেক পয়সা—কালই দিয়ে যাব।" বলে নীলকৃষ্ণবাবু বেকুবের মতো হেঁ হেঁ করে একটু হাসলেন।

শৈলপতিবাবু তেমনি পাতা ওল্‌টাচ্ছিলেন। একখানি পাতা খুলে খাতাখানা প্রায় চোখের কাছে তুলে ধরে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন—"বন্ধুত্ব বিষয়ক নীতি বটিকা। এক নম্বর বটি—'বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে হইলে বন্ধু-বান্ধবের নিকট অর্থাদি কর্জ চাহিবেক না।'

ব্যাখ্যা—ইহার দ্বারা—"কিন্তু বাকিটুকু শেষ না করে পায়ের শব্দে মাথা তুলে দেখেন দুই বন্ধু উঠে চলে যাচ্ছেন।

শৈলপতিবাবু দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "নীতিবাক্য না শোনার ফলেই আজ দেশে এত দুর্নীতি। তবে বড় আনন্দের কথা যে, আজকের ঘটনায় আমাদের তিনজনের বন্ধুত্ব অটুট রইলো!"



গুলুমামার গল্প

কলকাতা শহরে যে কয়টি পুরনো অঞ্চল আছে সেগুলোর মধ্যে আমাদের এই দর্জিপাড়া একটি, আর এখানে যত নতুন লোকের আমদানী হয়েছে তাদের মধ্যে গুলুমামা একজন। উনি আগে থাকতেন বাগবাজারে। তার আগে কোথায় থাকতেন জানিনে ; জিগ্যেস করলে বলেন, "ময়রার বাড়ি কোন দেশে তা জানলে কী পানতুয়ার তার বাড়ে ? খাবার তৈরি করা হচ্ছে হাতের কেরামতী। তোদের বয়সে মানে ছোটবেলায় আমাদের পাড়ার খাবারের দোকানে এক কারিগর ছিল। তার বাড়ি ছিল বর্ধমান। তাকে একদিন সবাই ধরে বসে, 'সীতাভোগ খাওয়াতে হবে।' বর্ধমান ইস্টিশানের সীতাভোগের তার কত রেলযাত্রীর মুখে লেগে আছে। ইস্টিশানের ভেজাল মালেরই যখন এত গুণ শহরের খাঁটি মাল না-জানি খেতে কেমন। আর ঐ লোকটার বাড়ি কিনা খাস বর্ধমান শহরে কার্জন ফটকের দক্ষিণ-পূব কোণ বরাবর। ফটকটা দেখেছিস্ ? দেখিস্ নি ?

দেখলে মনে হবে, পুরনো দিল্লী কী ইস্পাহানে এসে পড়েছিস। ওখানে বসে চোখ বুজলেই মনে হয়, দিল্লীর বাদশাহী দরবারের কথা ; মনে হয় ইরান দেশে উটের পিঠে চড়ে যেন ইস্পাহানের ফটক পার হয়ে শহরে ঢুকছিস। আমি যখন বর্ধমানে থাকতাম, তখন যেদিন দিল্লী কী ইস্পাহানে যেতে ইচ্ছে হতো সেদিন সন্ধ্যের একটু আগে ওর পাশে গিয়ে বসে চোখ বুজে তামাক টানতাম। আর সব ঘোরা হয়ে যেতো। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সেই বর্ধমানী কারিগরও নিজের মান বাঁচাতে বা দেশের নাম রাখতে একদিন তৈরি করলেন সীতাভোগ। সবাই খেয়ে বললে, 'সীতাভোগের মাথায় চাঁটি। এ হয়েছে রাম হালুয়া।' শুনে কারিগরের হাসি আর ধরে না। সেই থেকে লোকটির নাম হয়, 'রাম হালুইকার।' কাজেই আমি কোন্ দেশের লোক তা জানলে কী আমার গল্পের রস বাড়বে ?"

গুলুমামার কথা শুনে আমরা চুপ করে থাকি।

গত আষাঢ় মাসে একদিন এমন বৃষ্টি হলো যে, অলি-গলি-বড় রাস্তায় জল থৈ-থৈ করতে লাগলো। কয়লার দোকানের পাশে তাঁর ঘরটিতে বসে গুলুমামা তখন তামাক টানছিলেন। আমরা চার-পাঁচজনে ঘরে আটকা পড়লাম। তখন সন্ধ্যে হয় হয়।

মামা বললেন, "এই শর্মারাম ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানা, ডাকাত-দস্যুর একেবারে মুখোমুখি হয়েছে। আমি পরের মুখে ঝাল খাইনে, বানিয়ে মিথ্যে গল্প বলিনে। এই যে দেখছো হাড় ক'খানা—এ লোহার তৈরি ; শিরাগুলো সব তামার তার ; হৃৎপিণ্ডটা ইলেকট্রিক পাম্পের মতো। গুরুর কৃপায় ভয়-ডর কাকে বলে জানিনে।"

ভোঁদলা আমার কানে কানে বললে, "মামার চোখ দুটো কী রকম জ্বলছে! চুলগুলো খোঁচা খোঁচা ছুঁচের মতো মনে হচ্ছে। গোঁফজোড়া—"

তার গা টিপে বলি, "চুপ।"

মামা বললেন, "ভূতের সঙ্গে কিলোকিলির ঘটনাটা বলবো ? শুনবার সাহস আছে ?"

শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। বাইরে সন্ধ্যে নেমেছে, রাস্তায় গ্যাস জ্বলেনি, বৃষ্টির জন্যে বাড়ি-ঘরের দরজা বন্ধ। মামার ঘরেও কেরোসিনের আলো টিম্-টিম্ জ্বলছে। সকলেই সমস্বরে বললাম, "আজ থাক। ডাকাতের গল্প শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"হুঁ। গেঁয়োখালির নাম শুনেছিস, যেখানকার ওল লোকে আলুর চেয়েও তারিফ করে খায়? তখন আমি ওলের ব্যবসা করি। মণ মণ ওল জাহাজ বোঝাই করে চীন-জাপান চালান দি। বিশ্বাস হচ্ছে না? ওরা ভাত খায় জানিস তো? ভাত যারা খায় তারা ওল খাবে না কেন? ওদের দেশে ওল জন্মায় না, তাই পায় না। পায় না, তাই খায় না। কিন্তু একবার যে ওলের মর্ম বুঝেছে সে আর ছাড়তে পারে না। একবার একখানা জাপানী জাহাজ কলকাতায় আসছিল মালপত্তর নিয়ে। তার ক্যাপটেনকে ওল খাইয়েছিলাম। ফিরে যাবার সময় সে মণ মণ ওল জাপানে নিয়ে যায়, চীনদেশে চালান দেয়। সেই থেকে ওসব দেশে ওলের চাষ হচ্ছে। কী করে এ খবর পেলাম? খালাসীদের মুখে শুনেছি। এরা নাকি ওল চাকা চাকা করে কেটে চর্বিতে ভেজে মাস্‌টার্ড আর নুন মাখিয়ে খায়। আমাদের খালাসীরা ও দেশে গিয়ে ব্যঞ্জনটা খেয়ে এসেছে। তারা বলেছে ঠিক আলুভাজার মতো লাগে। ঐ গেঁয়োখালিতে থাকতেই একদিন ঠিক করলাম, কপিলমুনির আশ্রমে বেড়াতে যাবো।

"গেঁয়োখালির আড়পার সাগরদ্বীপ—ঐ যেখানে পৌষ-সংক্রান্তির মেলা বসে। লোকে যেখানে 'সাগরে' যায়। ঐ দুয়ের মাঝ দিয়ে গঙ্গা আর রূপনারায়ণ মিশে বয়ে চলেছে সাগরে। সেখানকার জলের দিকে তাকালেই বুক কাঁপে। যেমন চওড়া, তেমনি স্রোত, রং নেশাখোরের চোখের মতো, ঘোলাটে জল। হাঙর, মাছ, কাছিমে ভরা। সর্বক্ষণ দুলছে, একটু বাতাস উঠলে, বিশেষ করে বর্ষায় মেঘ করলে লক্ষ লক্ষ পাগল হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করে। তার মধ্যে পড়েছো কী আর রক্ষা নেই। কোথায় তলিয়ে

যাবে! কী, হাঙরে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। ঐ পাথার পার হয়ে পাল উড়িয়ে ছোট-বড় নৌকো চলে, জেলেরা ডিঙ্গিতে মাছ ধরে, দূর সমুদ্রে জাহাজ ভেসে যায়, দেশ-দেশান্তরের জাহাজ আসে। রাতের অন্ধকারে নৌকো-ডাকাতি হয়, কিন্তু ডাকাতেরা বন্দুক-পিস্তলের কাছে ঘেঁষে না। তারা ছিপে চড়ে চুপি চুপি আসবে, নৌকোয় উঠবে। বাধা দিয়েছো কী কেটে তোমায় জলে ফেলে দেবে। শান্ত সুবোধের মতো চুপচাপ বসে থাকবে। তারা তন্ন তন্ন করে নৌকো খুঁজবে, টাকা-পয়সা, দামী যা কিছু পাবে সব লুটে নিয়ে চলে যাবে। হাজার চীৎকার করলেও সেই পাথারে সে শব্দ কারো কানে পৌঁছবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না! এক কূলে দাঁড়ালে অপর কূল চোখেই পড়ে না; আর যেখানে সাগরে-নদীতে মেশামেশি সেখানে তো কূল নেই-ই। কেবল আকাশ আর জল। জল আর আকাশ সারা দিন রাত বাতাসে হা হা করছে। গাং চিলেরা মাছের দুঃখে কাঁদছে। এমন পাথার ভেলায় পার হতে পারিস্? কারো সাহসেই কুলোবে না। কিন্তু আমি পার হয়েছি।"

ভোঁদলা আমার কানে কানে বলে, "সেইজন্যেই গুলুমামা বলে ডাকি।"

আমি কিন্তু এর মধ্যে গুলের কিছু দেখলাম না। রবিনসন ক্রুসোর গল্প পড়ে কতদিন তার মতো হবার স্বপ্ন দেখেছি। সে কাহিনী যদি সত্যি হয় তবে এ কাহিনী মিথ্যে হবে কেন?

গুলুমামা বলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না?"

তাড়াতাড়ি বলি, "আমরা অন্য কথা বলছি মামা! আপনি তো জানেন, ভোঁদলাটা ছ্যাবলা। এক কথায় আর এক কথা বলে। আপনি বলুন, তারপর কী হলো। ভেলাটা কিসের? কলাগাছের?"

"না—না—সুঁদরী-গুঁড়ির। একদিন ভোরবেলা সের দুই চিড়ে, আধসের গুড় আর এক কলসী মিঠে জল নিয়ে সেই অথৈ পাথারে ভেলা ভাসিয়ে গেরুয়া রঙের পাল উড়িয়ে দিলাম।"

জিজ্ঞেস করলাম, "মিঠে জল কী ? সরবৎ ?"

"একদম গবেট ! খাবার জল—খাবার জল। জল পিপাসা পেলে খাবো কী ? সেই পাথারের জল যে লোনা।"

"কিন্তু ভেলায় পাল ওড়ালেন কেমন করে ?" বলে মণ্টু এমনভাবে তাকালো যেন বলতে চায় সব মিথ্যে।

গুলুমামা বলেন, "মাস্তুল খাটিয়েছিলাম, গেঁয়োখালির বাজার থেকে তৈরি পাল, দড়ি-দড়া কিনেছিলাম, বুঝলে ছোকরা ? আর নিয়েছিলাম লগি আর তেলে জলে পাকানো বাঁশের মোটা লাঠিখানা। এই ছিল আমার অস্ত্র। ভোরে যখন ভেলা ভাসাই তখন তীরে দাঁড়িয়েছিল তোদের বয়সী দুটো ছেলে। আমাকে রওনা হতে দেখে তাদের একজন ছুটে গিয়ে জনকয়েক বয়স্ক লোককে ডেকে আনলে। তারা তীরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'ফিরে আসুন। ফিরে আসুন। ধর, ধর, লোকটা পাগল হয়ে গেছে।' কিন্তু প্রখর স্রোতের টানে ভেলা ততক্ষণে খানিকদূর ভেসে গেছে। চীৎকার করে তাদের অভয় দিতে লাগলাম, 'ভয় নেই—ভয় নেই। আবার ফিরে আসবো।'

"আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘ এক এক সময়ে কালো হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে। এলোমেলো বাতাস বইছে, উথাল-পাথাল জল। নির্ভয়ে পাল তুলে, হাল ধরে বসে রইলাম। রক্তের গন্ধ পেয়ে ভেলার পিছনে চলেছে হাঙরের ঝাঁক। দেখে ভারি মজা বোধ হতে লাগলো। এক এক সময়ে তারা জলের উপর মাথা তুলে হাঁ করে। তখন করাতের মতো দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে। এমনি করে সেই উথাল-পাথাল জল পার হয়ে শেষ বেলায় এসে পৌঁছলাম সাগরদ্বীপে। তখন ভাটা পড়েছে। একহাঁটু কাদায় নেমে ভেলাটাকে কাদার উপর দিয়ে খানিকদূর টেনে নিয়ে লগি পুঁতে বেঁধে রেখে, চিড়ে-গুড়-জলের কলসী কাঁধে, লাঠি হাতে এগিয়ে চললাম। সামনে অল্প জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে একখানা পুরনো কোঠাবাড়ির একটু দেখা যাচ্ছিল।"

ভোঁদলা বলে, "সাগরদ্বীপে কোঠাবাড়ি? সেখানে তো জনমানব থাকে না, গভীর জঙ্গল; জঙ্গলে বাঘ-হরিণ—"

মামা হেসে বলেন, "বোকা আর কাকে বলে রে! জঙ্গল সরকার থেকে রেখে দেওয়া হয়েছে কপিলমুনির আশ্রমের কাছাকাছি। আর সব আবাদ—ধানক্ষেত। তার মাঝে মাঝে লোকের বসতি। কমসে কম এক লক্ষ চাষ-জীবী লোক বাস করে ওখানে। দ্বীপটা লম্বা-চওড়ায় কত জানিস্? লম্বায় উনিশ মাইল মানে সাড়ে ন' ক্রোশ—হাওড়া থেকে চন্দননগর যতটা প্রায় ততটা। আর চওড়া মাইল এগারো, কোন কোন জায়গায় তিন মাইলও হবে। তবে হ্যাঁ, সাপ আছে। ঐ জঙ্গলে দু-দশটা হরিণও থাকে আর সমুদ্রের ধারে নানা রকমের সামুদ্রিক পাখির মেলা। তবে জঙ্গল ছিল সেকালে যেকালে ওটা ছিল বোম্বেটের আড্ডা। তিন-চারশ বছর আগের সেই বোম্বেটেদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি—"

সকলে একসঙ্গে বিস্ময়ে বলে উঠলাম, "গুলুমামা! এ একদম—"

"গুল। এই তো বলতে চাস্? ওরে! তোদের এখনও জানতে অনেক বাকি। তারা এখন কেউ বেঁচে নেই সত্যি, কিন্তু তাদের আলোক-চিত্র—ফটো—প্রকৃতি তার ঘরে সযত্নে টাঙিয়ে রেখেছে। এখন শোন্। জঙ্গল আর কাদা ভেঙ্গে সেই বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পিছন ফিরে দেখি, সেকালের দুখানা পাল-তোলা জাহাজ এসে নোঙর করলো। আর সামনের জাহাজ থেকে দুখানা ডিঙি ফিরিঙ্গি বোঝাই হয়ে জলে নেমে দাঁড় টেনে ডাঙার দিকে আসতে লাগলো। তাদের হাতে সেকেলে গাদা বন্দুক। দেখেই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেলাম। কিন্তু তারপরই দেখি, কোথাও কিচ্ছু নেই, বিশাল পাথার দুলছে, ডাক ছাড়ছে, দূরে—বহুদূরে দেখা যায় মেদিনীপুরের তীর, যেন কালির লম্বা দাগ। কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না কেন এমন হলো।"

বললাম, "ভূত নয় তো?"

মামা বললেন, "দিনের বেলায় কী ভূত দেখা দেয়? বোম্বেটেরা

সবাই যে ভূত হয়ে আছে এতে আর ভুল নেই। ওরা কেউই স্বর্গে যেতে পারেনি। কিন্তু হোক না ওরা সাহেব-বোম্বেটে ভূত, দিনের বেলা দেখা দিতে ওদের সাহস হবে না। যাহোক, সেই বাড়িখানার কাছে গিয়ে দেখি তা একেবারে ভাঙা-চোরা, জঙ্গলে ভরা। একদিকের খান-দুই দেয়াল মাত্র খাড়া আছে। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই সাপ-ক্ষোপের বাসা। এখন কোথায় যাই? ঝড়-বৃষ্টিতে গাছতলা নিরাপদ নয়, ভাঙা বাড়িটাও মৃত্যুপুরীর সমান, বেলাও ডুবে এল। কোথায় একটু আশ্রয় পাওয়া যায়? এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখি, আমার একেবারে সামনে বোম্বেটের দল, তলোয়ার, ছোরা, কুড়ুল দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করছে। আমার দিকে তারা ভ্রুক্ষেপই করছে না। তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদেরই দেশের চার-পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ে। তারা অসহায়ের মতো নিঃশব্দে কাঁদছে। সেকালে বোম্বেটেরা আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে সাগর-পারে দাসের হাটে বেচতো। মনে হলো, যারা জাহাজ থেকে তখন নেমেছিল তারাই এসে মারামারি বাধিয়েছে। ছেলেমেয়ে ক'জনকে এখানে যে দল ছিল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। ছেলে-মেয়েগুলোকে উদ্ধার করবার জন্যে লাঠি হাতে তাদের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়বার আগেই হঠাৎ দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল।

"তখন আমার ধারণা হলো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আর সাধারণ সুস্থ মানুষ থাকবো না। এসব কী দেখছি? কিন্তু যাবোই বা কোথায়? সূর্য পশ্চিম আকাশে সোনা ছড়িয়ে ওপারে ডুবে গেল। শেষে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় গিয়ে বসে পড়লাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়ে গেছে। মনে কেবল ঐ দৃশ্যের চিন্তা—এ কী দেখলাম? ক্রমে সন্ধ্যা নামলো; ভাটা শুরু হয়েছে। দূরে নদীর বুকে এখানে-সেখানে দু-একখানা নোঙর-করা জাহাজের চারধারে জোনাকি উড়ছে, নির্জন কূলে নদীর ঢেউ বৃথা আঘাত করছে। আমি বসে বসে ভাবছি, এ কী দেখলাম? কোথায় এলাম? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উত্তর পেয়ে গেলাম। ওটা

আশ্চর্য ঘটনা হলেও অসম্ভব কিছু নয়। প্রকৃতি তার দেহে ঐ দৃশ্যের ফটো তুলে রেখেছে। বুঝতে পারলাম, আবহাওয়ার যে অবস্থায় দৃশ্যগুলোর ফটো তুলেছিল কখন কখন, দুশো, পাঁচশো, পাঁচ হাজার, দশ হাজার বা তার চেয়েও বেশি সময়ের মধ্যে ঠিক সেই অবস্থা ঘটলে ফটোগুলো হঠাৎ দেখা যায়। সাগরদ্বীপের এই নির্জন কূলে বেলা শেষে তাই দেখছি। উত্তরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমায় অবশ করে ফেললো। আমি—"

সকলে সমস্বরে বলে উঠলাম, "মামা, এ হতেই পারে না। একেবারে গুল—কয়লার গুল নয়, তামাক পোড়ার গুল।"

"গুল তো গুল।" বলে মামা নির্বিকারভাবে তামাক টানতে লাগলেন।

আমরা বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে উঠে এলাম বটে, কিন্তু মামার কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিতে দিতে এমন চেপে বসলো যে, একসময়ে মনে হলো হতেও পারে বা!